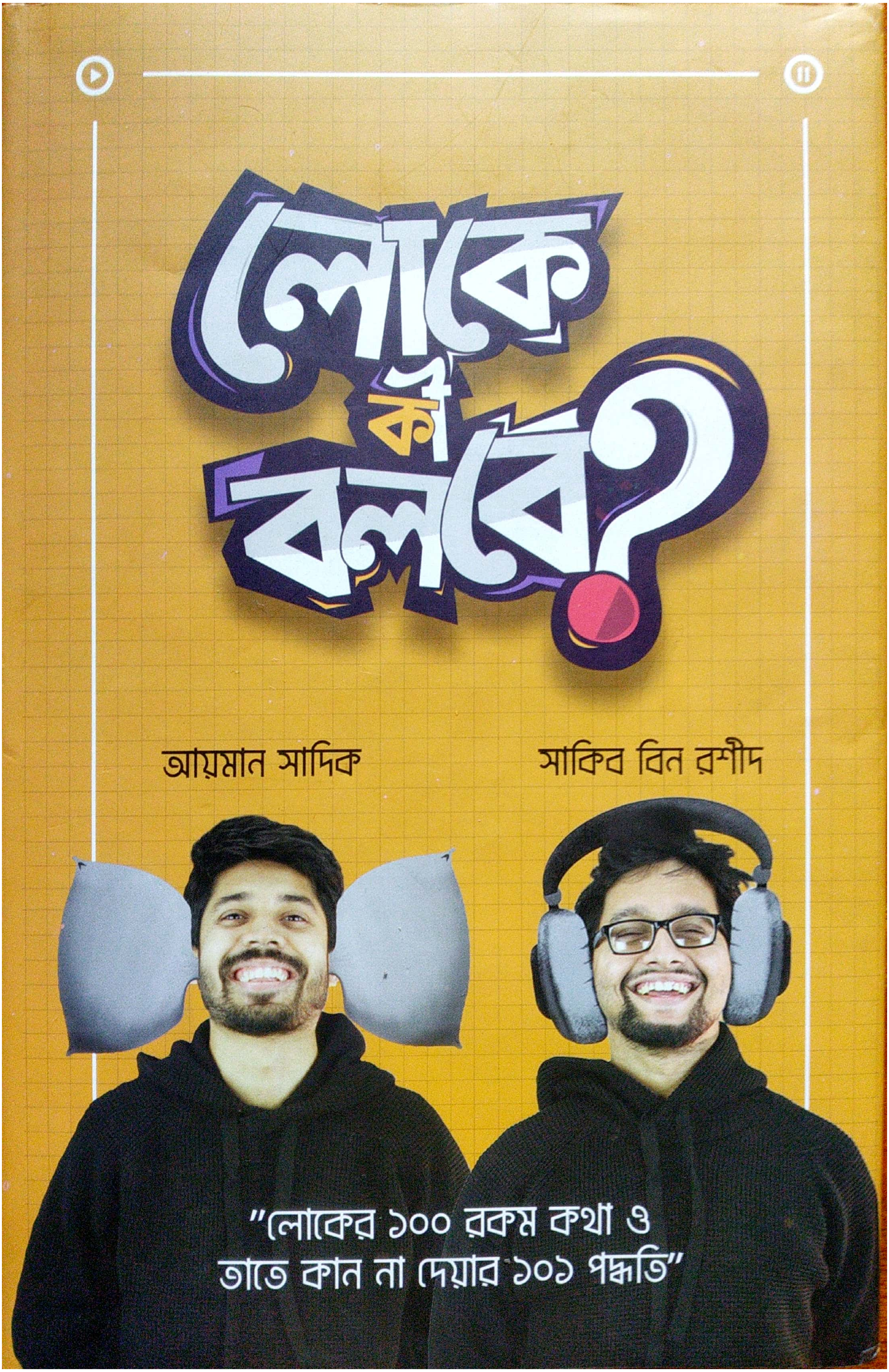
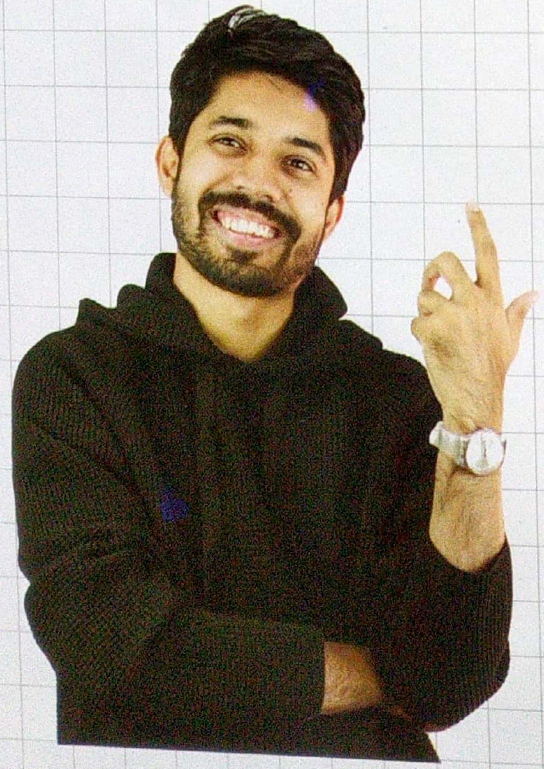

লোকে কী বলবে?
আয়মান সাদিক
সাকিব বিন রশীদ
"লোকের ১০০ রকম কথা ও
তাতে কান না দেয়ার ১০১ পদ্ধতি"

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অনলাইন স্কুল, 10 Minute School-এর প্রতিষ্ঠাতা আয়মান সাদিক। 10 Minute School-এ প্রতিদিন সাড়ে তিন লাখের বেশি শিক্ষার্থী বিনা মূল্যে পড়াশোনা করছে। তিনি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় অভূতপূর্ব অবদান রাখার জন্য ইতিমধ্যেই রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের কাছ থেকে পেয়েছেন Queen's Young Leader পুরস্কার। এ ছাড়া ২০১৮ সালে তিনি বিশ্বের স্বনামধন্য ফোর্বস ম্যাগাজিনের 30 Under 30 লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাঁর প্রথম বই 'Never Stop Learning' ছিল ২০১৮ সালের 'অমর একুশে বইমেলা'র বেস্টসেলার। ২০১৯ সালে প্রকাশিত 'ভাল্লাগে না'- বইটিও ছিল বইমেলার বেস্টসেলার । তিনি তাঁর ফেসবুক পেইজ ও ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রতিদিন শিক্ষণীয় নানা বিষয়ে ভিডিও তৈরি করে লাখো শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে শিক্ষাদান করে যাচ্ছেন।

Ayman Sadiq

www.aymansadiq.com



ISBN: 978-984-8040-91-1

www.adarsha.com.bd

লোকে কী বলবে?

আয়মান সাদিক ও সাকিব বিন রশীদ

আদর্শ

প্রকাশক: **আদর্শ**
কনকর্ড এম্পোরিয়াম কাটাবন, ঢাকা ১২০৫
৩৮ পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০
+০২-৯৬১২৮৭৭, ০১৭৯৩২৯৬২০২, ০১৭১০৭৭৯০৫০
info@adarsha.com.bd
www.adarsha.com.bd

লোকে কী বলবে?

১ম প্রকাশ: ১৮ মাঘ ১৪২৬; ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ (১০,০০০ কপি মুদ্রিত)

প্রচ্ছদ: আসিফ হোসেন
মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা: আদর্শ প্রিন্টার্স
রকমারিতে আদর্শর বই: www.rokomari.com/adarsha

মূল্য: বাংলাদেশে ২৫৫ টাকা

Loke Ki Bolbe? (Published in Bengali)
by *Ayman Sadiq & Sakib Bin Rashid*
Published by Adarsha
Concord Emporium, Kataban, Dhaka 1205
38 P. K. Ray Road, Banglabazar (1st floor), Dhaka 1100

ISBN: 978-984-8040-91-1

উৎসর্গ

বইয়ের কথাগুলো যেন আজ থেকে আর কেউ কাউকে উৎসর্গ না করে তাই এই বই লেখা। আমরাও তাই এই বই কাউকে উৎসর্গ করব না। দেখি না লোকে কী বলে।

১. বইয়ের নিয়ম মানে নাই;

২. খুব সৃজনশীলতা দেখাইতে গেসে;

৩. এরা তো বই লিখতেও জানে না;

৪. বই লেখার একটা নিয়ম তো মানতেই হয়;

৫. এরা ভাই লেখক না, লিখতে আসছে;

৬. উৎসর্গ ছাড়া বই বর্জন করা উচিত।

সূচি

ভূমিকা

এই বইয়ের দুজন লেখকের বয়সই এখন ২৭ (সাকিবের আসলে ২৮, হিসাবের সুবিধার্থে ২৭ ধরে নিলাম আরকি)। এই বই লেখার পরিকল্পনা শুরু হয় আরও দুই বছর আগে থেকে যখন আমরা ২৫ বছরের দুর্বার তরুণ আর মনে প্রতিবাদের তীব্র জ্বালা। ভেবেছিলাম একটি বই লিখে সমাজের নানা অসংগতি তুলে ধরব। লোকজনের নানা কটু কথার দাঁতভাঙা জবাব দেব। বেশ কিছু স্পর্শকাতর বিষয় নিয়েও আলাপ করব। কিন্তু তা করতে করতে দুই বছর পার হয়ে গেল কেন? আমরা আসলে এত দিন ভয় পাচ্ছিলাম যে লোকে বলবে, 'এই দুই ছোট্ট অনলাইন শিক্ষক আবার এসব নিয়ে কথা বলার কে? এদের নিজেদেরই তো কোনো অভিজ্ঞতা নেই। বয়স হয়েছে নাকি? বোঝে কম, বকে বেশি। আসলে তাদের লেখক হওয়ার শখ জেগেছে; তাই এসেছে জ্ঞান দিতে।'

পরে চিন্তা করে দেখলাম 'লোকে কী বলবে?' এই সংশয় যদি নিজেদের মধ্য থেকে দূর করতেই না পারি তবে এই বই লেখার কোনো যোগ্যতাই আসলে আমাদের নেই। তারপর সব ভয়-সংশয় দূর করে লিখেই ফেললাম, 'লোকে কী বলবে?' তারপর নিজেদের ভেতর থেকে চিরতরে তাড়িয়ে দিলাম 'পাছে লোকে কিছু বলে'র ভয়।

প্রিয় পাঠক, আমাদের ভয়, সংকোচ, সংশয় তো তাড়িয়ে দিলাম, এবার আপনার পালা। আপনাকেও আমাদের দলে যোগ দেওয়ার অনুরোধ রইল। পাশে থাকব আমরা, চলুন, শুরু করা যাক।

কীভাবে পড়বেন বইটি?

বইটি পড়তে পড়তে হয়তো বেশ কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আপনার মনে পড়ে যাবে—এমন কিছু কটু কথা মনে পড়ে যাবে যেগুলো আপনাকে কিংবা আপনার সামনে কাউকে বলা হয়েছিল, কিন্তু আপনি তার কোনো জবাব দিতে পারেননি। এই বইয়ে আমরা আপনার হয়ে সেই সব কথার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বইয়ের সাথে মিলে যায় এমন কোনো কথা যদি আপনি কারও কাছ থেকে শুনে থাকেন তবে—

- মিলে যাওয়া অংশটির ছবি তুলে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করুন, বইটির এই লেখাটুকু কেমন লেগেছে। উত্তরের অপেক্ষায় থাকার দরকার নেই। সে নিজেই বাকিটা বুঝে নেবে।
- যদি মনে করেন তাতেও কাজ হবে না তবে নির্বাচিত অংশটুকু দাগিয়ে (হাইলাইট করে) ছবি তুলে তাকে পাঠিয়ে দিন। কিংবা নির্বাচিত অংশটুকু হাইলাইট করে বইটি পড়া শেষে তাকে উপহার দিন। মানুষটি বুদ্ধিমান হলে, হাইলাইট দেখে যা বোঝার বুঝে যাবে।

সতর্কীকরণ

বইয়ের কিছু চ্যাপ্টারের নাম পড়লেই আপনার মেজাজ খারাপ হতে পারে। আপনাকেও এটা শুনতে হয়েছিল। রাগ যেহেতু করবেনই তাই বই পড়ার আগেই রাগ কমানোর কিছু বন্দোবস্ত করে নিয়ে বইটি পড়া শুরু করেন না হলে পড়তে পড়তে কারও কথা মনে পড়ে যাবে আর তখন তাকে ফোন করে ঝাড়াঝাড়ি শুরু করে দিতে পারেন। আমরা আবার শান্তিপ্রিয় মানুষ আর তাই চাই না আমাদের বইটি পড়ে কারও জীবনে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হোক। ঝুঁকি আরও একটু কমানোর জন্য এক গ্লাস পানি খেয়ে বইটি পড়া শুরু করুন। আর আরেকটা অনুরোধ, অনেক আগে যেসব কটু কথা মানুষের কাছ থেকে শুনেছেন, সেগুলো এই বই পড়ে মনের ভেতর পুষে রাখবেন না; বরং সেই মানুষগুলোকে মন থেকে ক্ষমা করে দিন। এই রাগগুলো নিজের মধ্যে পুষে রাখলে কিন্তু নিজেই কষ্ট পেতে থাকবেন। সামনের দিকে দেখুন। নিজেকে অভিবাদন জানান, কেননা আপনি সেই সব কটু কথা শুনেও আজ এই পর্যন্ত এসেছেন বা এখনো টিকে আছেন, এখনো হেরে যাননি।

বইয়ের কিছু অংশ আমাদের থেকে যারা বয়সে বড় তাদের জন্য, আর বেশির ভাগ অংশই আমাদের বয়সী কিংবা আমাদের স্নেহের ছোট ভাইবোনদের জন্য লেখা। সে কারণেই এই বইয়ের কোনো কোনো জায়গায় পাঠককে 'আপনি', আবার কোনো কোনো জায়গায় 'তুমি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

আত্মশুদ্ধি

এই বইটি মূলত প্রতিদিন আমরা ঘরে-বাইরে, কর্মস্থলে, রাস্তা-ঘাটে যত কটুকথা, যত অপমান ও বৈষম্যমূলক কথা শুনে থাকি সেই সব কথা নিয়ে লেখা। পাশাপাশি এই কথাগুলো যেই 'লোকেরা' বলে তাদেরও একটা উচিত জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে।

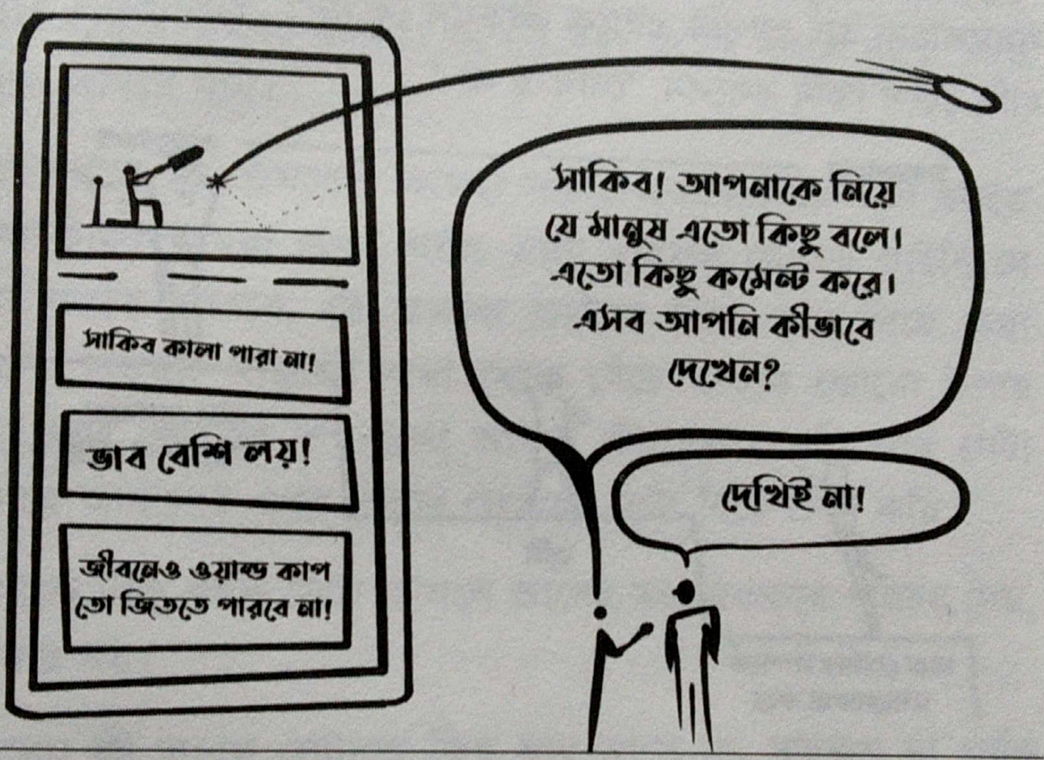
এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন, 'এই ব্যাটা, তোমরা কি ওই সব লোকের বাইরে? তোমরা কি কখনো এগুলো বলো নাই?'

– হ্যাঁ, বলেছি। এই বইয়ের অনেক কথাই আমরা আমাদের জীবনেও বলেছি, যাতে হয়তো অনেকেই কষ্ট পেয়েছে। তাই শুরুতেই নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি। আর যত মানুষকে আমরা এই কথাগুলো জেনে বা না জেনে বলে ফেলেছি তাদের কাছে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাইছি। শুধু ক্ষমা চেয়েই মামলা খালাস করতে চাই না; প্রায়শ্চিত্তও করতে চাই। আর সে জন্যই এই বই লেখা। এই আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়ায় আমরা আপনাদেরও যুক্ত করতে চাই।

এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় পড়ে মনে হতে পারে, 'আরে তাই তো, আমার সাথেও তো এমন হয়েছে। কিন্তু এটাও ভুলে যাবেন না, আমাদের মধ্যেই কেউ না কেউ সেসব কটু কথা বলেছে। 'লোকে কী বলবে'-এর 'লোক' কিন্তু আকাশ থেকে পড়েনি। আমি-আপনিই সেই লোক।

বইটির প্রতিটি অধ্যায় পড়ার পর নিজেকে অন্তত একবার আন্তরিকভাবে জিজ্ঞেস করুন, আমি নিজে কি কখনো এই কথাটা কাউকে বলছি? আর যদি এই প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেলুন যে এ ধরনের কথা আর কখনো কাউকে বলবেন না।

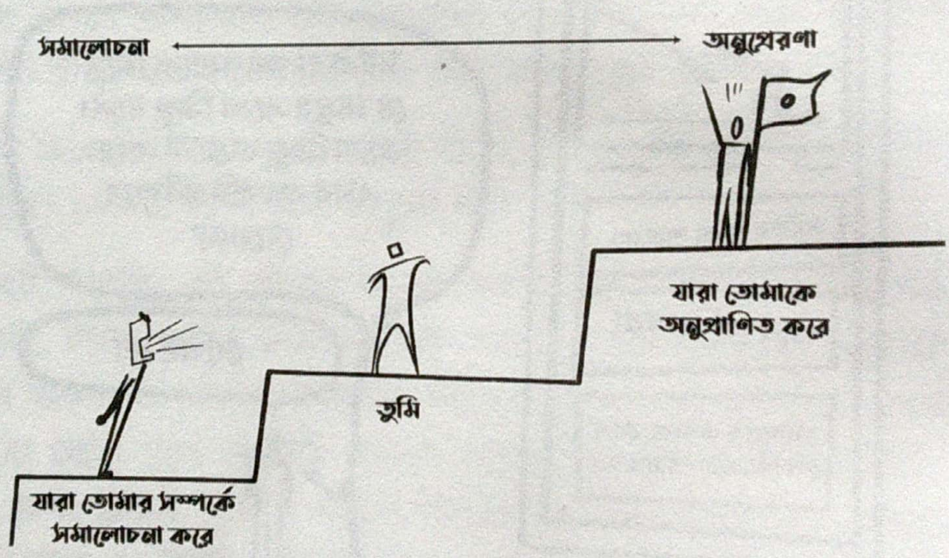
সাকিব আল হাসানের মতো ভাবতে শিখুন



এই যে সাকিব আল হাসান এত ভালো খেলেন, তিনিও যদি ম্যাচের আগে বা পরে ফেসবুক খুলে তার পোস্টের কমেন্টসগুলো পড়তেন তাইলে হয়তো এত ভালো খেলতে পারতেন না। তিনি জানেন যে তিনি খেলেন আর অন্যরা তাঁর খেলা দেখার জন্য বসে থাকেন। তাঁর তুলনায় যারা ক্রিকেটের কিছুই বোঝে না তারাও অনবরত তাঁর উদ্দেশে উপদেশ বা গালি ছুঁড়তে থাকেন।

এই 'আমি খেলছি, আর বাকিরা তো শুধুই দেখছে'—মনোভাবটা আমাদেরও সব কাজের মধ্যেই আনা দরকার। একজন যদি বলেও

যে আমার আইডিয়া বা আমার কাজটা খারাপ তাহলে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, আমি তো কাজটা করেছি, আর সে তো না করেই সমালোচনা করছে। (তবে হ্যাঁ, অন্যদের গঠনমূলক সমালোচনাও অবশ্যই আমরা শুনব।) তার মন্তব্যে আমার কাজের কিছু যায়-আসে না; যেমনটা আমাদের কমেন্টে সাকিবের খেলার কিছু যায়-আসে না। আমাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসী এই মনোভাবটা তৈরি করতে পারলে আমরা নিজেরাও নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে সাকিব আল হাসান হয়ে উঠতে পারব। এই তো কিছুদিন আগে এক রিপোর্টার সাকিব আল হাসানকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনাকে নিয়ে যে এত আলোচনা-সমালোচনা হয়, আপনি এটাকে কীভাবে দেখেন?' স্বভাবসুলভ মুচকি হাসি হেসে তিনি বললেন, 'দেখি-ই না।'



একটা জিনিস খেয়াল করেছেন? যে মানুষগুলো আপনাকে নিয়ে কটুকথা বলে সেই মানুষগুলো আপনার চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে আছে। যারা আপনার ওপরে চলে গেছেন তারা আসলে জানেন যে সাফল্যের পথটা কতটা কঠিন। এখানে কত ব্যর্থতা আসে। আর তাই তারা কখনো আপনার ব্যর্থতা নিয়ে কটু কথা বলবেন না। বলবেন তারাই যাদের এই ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই। যারা আপনার নামে কটু কথা বলছে তারা নিজ থেকে সব সময় আপনার দিকে কথা কিংবা ফেসবুকের কমেন্ট ছুড়ে মারবে যেন আপনি কোনোভাবে সেটার আঘাতে তাদের জায়গায় নেমে যান। এটাতেই তাদের সুখ। কারণ তারা হয়তো আপনার মতো সাহসী না যে তারা নতুন কোনো কাজের

উদ্যোগ নেবে। আর তাই ওপরের মানুষদের টেনে নিচে নামিয়ে তাদের দল ভারী করতে চাইছে। কারণ ভেড়ার পালের মাঝে লুকিয়ে বেঁচে থাকাতেই তাদের জীবনের সার্থকতা। অন্যকে নিচে নামানোর ইচ্ছার মধ্যে একটা পৈশাচিক আনন্দ কাজ করে। আপনি কিছু করছেন আর সে কিছুই করছে না, ব্যর্থতার এই অনুভূতিকে সে সামাল দিতে পারে তখনই যখন সে দেখতে পায় যে আপনিও ব্যর্থ হচ্ছেন।

এখন আপনিই বলুন, আপনার থেকে পিছিয়ে পড়া, অন্যের ব্যর্থতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এসব পরজীবী মানুষের কথায় আপনি কেন পিছিয়ে থাকবেন? ওদের বলতে দিন। বলতেই থাকুক, বলাতেই আবদ্ধ থাকুক তাদের জীবন। আপনি বরং স্বপ্নের মশাল হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে যান।

সত্যি বলতে কি, কমবেশি আমরা সবাই অন্যকে নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি। আমরা এখন পর্যন্ত এমন একজন লোকও পাইনি যে কিনা বলতে পারবে, সে কখনো কাউকে নিয়ে তার পিছে কথা বলেনি। সুতরাং মানুষের কথা থেকে বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই। বরং লোকের কথাগুলো আমরা কীভাবে দেখছি আর সেটা কীভাবে আমাদের ওপর প্রভাব ফেলছে, সেটা নিয়ে চিন্তা করি।

১. লোকে কিছু বলল সেটা আসলে তাদের মানসিকতার পরিচয় দেয়, আপনার নয়।

২. মানুষ কী ভাবল সেটাতে কিছু যায়-আসে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি কী চিন্তা করছেন সেটা বদলাচ্ছে।

৩. কারও মনোভাব পরিবর্তনের কোনো দায়ভার কিন্তু আপনার না।

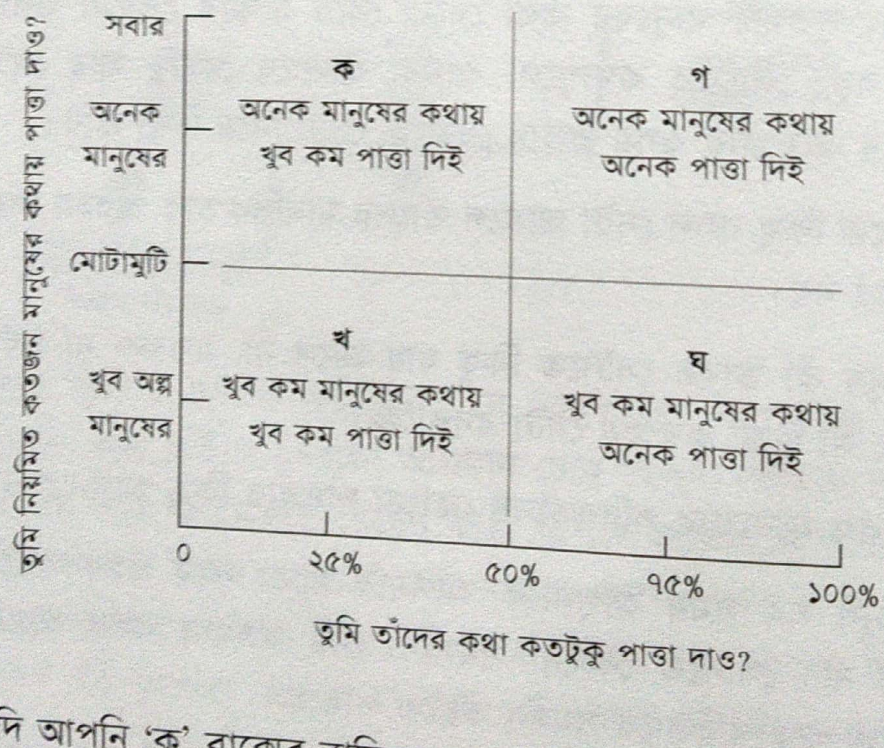
৪. মানুষ সব সময় আপনাকে আপনার মতো করে গ্রহণ করতে চাইবে না। সেটাতে কোনো সমস্যাও নেই যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজেকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন করতে পারছেন।

৫. মানুষের কথার লাগাম আপনার হাতে নেই কিন্তু আপনি কার কথায় কান দেবেন আর কোনদিকে মনোযোগ দেবেন সেটা কিন্তু আপনার হাতেই আছে।

লোকে কী বলবে ম্যাট্রিক্স

এই যে বললেন মানুষের কথায় কান দেওয়া যাবে না, তাহলে কি কারও কথায় কান দেব না? এই ওপরের ম্যাট্রিক্সে আপনার অবস্থান কোথায় এটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরটা আপনার কাছে একদম সহজ হয়ে যাবে।

এবার আসুন নিচের চিত্রটার দিকে তাকাই!



যদি আপনি 'ক' বাক্সের বাসিন্দা হন, অর্থাৎ আপনি অনেক মানুষের কথাই শোনেন কিন্তু কারওটাই খুব বেশি পাত্তা দেন না, তাহলে

আপনি ম্যাট্রিক্সের মোটামুটি সুবিধাজনক জায়গায় আছেন। তবে আরও কমসংখ্যক মানুষের কথা কানে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

যদি আপনি 'খ' বাক্সের বাসিন্দা হন, অর্থাৎ আপনি খুব কম মানুষের কথা পাত্তা দেন এবং পরিমাণেও খুব কম পাত্তা দেন, তাহলে আপনি আরও ভালো একটা অবস্থানে আছেন। আপনি নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত, নিজেকে মূল্যায়ন ইত্যাদির দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবং এ জন্য আপনাকে সাধুবাদ।

যদি আপনি 'গ' বাক্সের বাসিন্দা হন, অর্থাৎ আপনি অনেক বেশি মানুষের কথা পাত্তা দেন এবং পরিমাণে অনেক বেশি পাত্তা দেন। সোজা কথায় কেউ আপনার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করলেই আপনি রীতিমতো পিকেজি (পেরা খেয়ে গাছে।) আপনি যদি এই বাক্সের বাসিন্দা হন, তাহলে আপনি একটু বিপদে আছেন। আপনাকে সহজেই প্রভাবিত করতে পারে এমন মানুষের সংখ্যা কমাতে হবে এবং আপনাকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পারে সে পরিমাণও কমাতে হবে।

এই বইয়ের লেখকদ্বয়ের সবচেয়ে প্রিয় বাক্স কিন্তু বাক্স 'ঘ'। যেখানে আপনি অল্প কিছু মানুষের কথা পাত্তা দেবেন, কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে পাত্তা দেবেন। এ কথা কেন বললাম? জীবনে উন্নতি করার জন্য, সফল হওয়ার জন্য কিছু পরামর্শক, মেন্টর, রোল মডেল খুব বেশি দরকার। যার সাথে আপনি আপনার জীবনের সমস্যা, আপনার স্বপ্ন এবং সেগুলো পূরণে যে বাধা আছে তা নিয়ে খোলামেলাভাবে আলোচনা করতে পারবেন এবং তিনি তার অভিজ্ঞতার আলোকে আপনাকে ভালো পরামর্শ দিতে পারবেন। এ রকম মেন্টর যে কেউই হতে পারে। আপনার বাবা-মা, শিক্ষক, বড় ভাইবোন। শুধু কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে।

১. সেই মানুষটি আপনার সম্পর্কে যথেষ্ট জানেন কি না এবং আপনাকে যে পরামর্শ তারা দিচ্ছেন তা আপনার জীবনের বাস্তবতাকে বিবেচনা করে দিচ্ছেন কি না।

২. সেই মানুষটি সত্যি সত্যি আপনার ভালো চান কি না।

৩. উনি নিজের জীবনে যথেষ্ট সুশৃঙ্খল ও পরিশ্রমী কি না।

এই ৩টি প্রশ্নের উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়ে যায়, তাহলে আপনি আপনার মনমতো একজন মেন্টর পেয়ে গেছেন। এ ক্ষেত্রে তার কথাগুলো পাত্তা না দেওয়াই বরং ভুল হবে।

তুমি এত প্রশ্ন করো কেন?

আব্বু, আকাশ নীল কেন? . . .

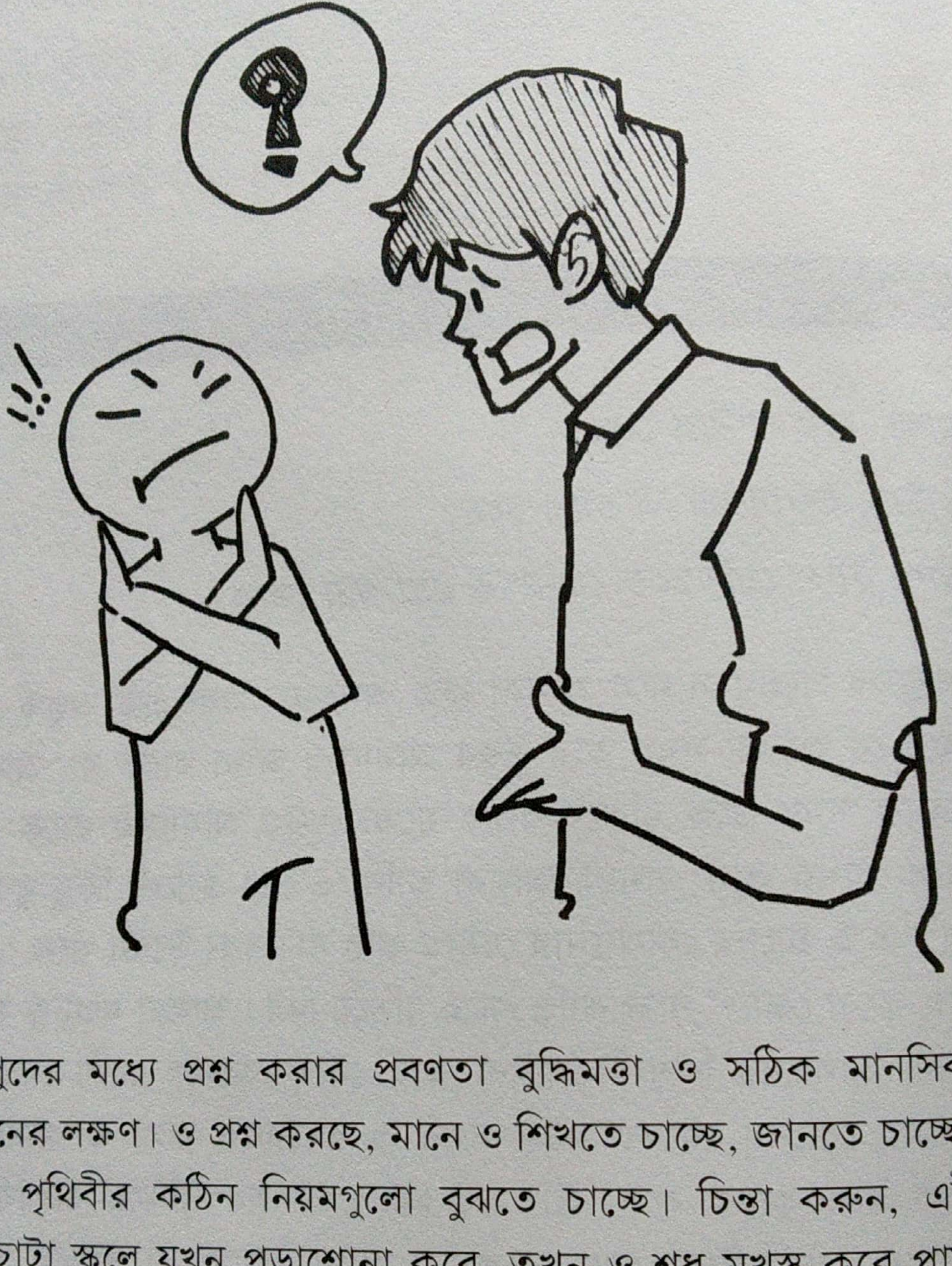
ভাইয়া, ইন্টারনেট কীভাবে চলে?

আপু, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট কেন? ও তো পচা লোক।

শিশুদের প্রশ্নের সামনে আমরা কত অসহায়। ওরা এত অদ্ভুত প্রশ্ন করে যে অনেক সময় তার উত্তর আমাদের জানা থাকে না, আবার অনেক সময় ওকে বুঝিয়ে বলার মতো ধৈর্যও আমাদের থাকে না। তবে বেশির ভাগ সময়ই আমরা ভাবি 'ও তো এগুলো কিছু বুঝবে না।' তাই তাদের বোঝানোর চেষ্টাও করি না। বরং উল্টো ওকে 'এত প্রশ্ন করো কেন?' বলে ঝাড়ি মেরে বসিয়ে দিই। আমরা যতটুকু মনে করি, আমাদের শিশু-কিশোররা তার থেকে অনেক বেশি বোঝে। আমার বোনের ছেলের বয়স যখন ৩ বছরেরও কম, ও আমাকে ব্রেক-আপ কাকে বলে, কীভাবে হয়, কেন হয় বুঝিয়ে বলেছিল। আমার এক কলিগ ফোনের কোনো অ্যাপ বুঝতে না পারলে তার মেয়ের কাছে নিয়ে যায়। তার মেয়ের বয়স সাড়ে ৫ বছর।

আবার ভেবে দেখুন, আমরা আমাদের বোঝানোর অক্ষমতাকে 'ওরা বুঝবে না' বলে চালিয়ে দিচ্ছি না তো? আলবার্ট আইনস্টাইন কিন্তু বলেছেন, 'যদি আপনি কোনো কিছু একজন ৬ বছর বয়সীকে বুঝিয়ে বলতে না পারেন, তাহলে আপনি নিজেই তা ভালোমতো বোঝেন

না।’ তাই ‘তুমি বুঝবে না’ বলার আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, ‘আমি ঠিকমতো বোঝাতে পারছি তো?’



শিশুদের মধ্যে প্রশ্ন করার প্রবণতা বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক মানসিক গঠনের লক্ষণ। ও প্রশ্ন করছে, মানে ও শিখতে চাচ্ছে, জানতে চাচ্ছে, এই পৃথিবীর কঠিন নিয়মগুলো বুঝতে চাচ্ছে। চিন্তা করুন, এই বাচ্চাটা স্কুলে যখন পড়াশোনা করে, তখন ও শুধু মুখস্থ করে পাস করার চেষ্টা করে না। ও সত্যি সত্যি শেখার জন্য পড়াশোনা করে। আর সে জন্যই প্রশ্ন করে। কিছুই না বুঝলে কিন্তু প্রশ্ন করার কথা না। চিন্তা করুন, প্রশ্ন করলে বন্ধুরা খেপাতে পারে, এটা জেনেও কী পরিমাণ সাহস নিয়ে সেই বাচ্চাটা ক্লাসে হাত তোলে, ‘স্যার, একটা কোয়েশ্চেন।’ তখন যদি সেই স্যার তাকে বকাঝকা করে বসিয়ে দেন, তাহলে সেটা সেই বাচ্চাটার মেধা আর মননের প্রতি কী ভয়ংকর অন্যায়! সেই বাচ্চাটা কি এরপর আর প্রশ্ন করার সাহস

পাবে? ওই ক্লাসের আর কেউ কি প্রশ্ন করার সাহস পাবে? দিনশেষে সেই ক্লাসের, সেই স্কুলের আর আমাদের সমগ্র দেশের বাচ্চারা যে কোনো প্রশ্ন না করে, বোঝার চেষ্টা না করে মুখস্থ করে যাচ্ছে, তার পেছনে 'এত প্রশ্ন করো কেন?' এই কথাটা কি অনেকাংশেই দায়ী না?

আপনি শিশুটির শিক্ষক হন, অভিভাবক হন বা বড় ভাইবোন হন, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ, ওকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিন। প্রশ্ন করা ওকে স্বাবলম্বী ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলবে। ওকে যদি কেউ ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে ও তাকে প্রশ্ন করে আটকে দিতে পারবে। ওকে যদি কেউ ঠকাতে চায় তাহলে ও প্রশ্ন করে নিজের দাবি আদায় করে নিতে পারবে। আর যদি আপনি ওকে প্রশ্ন করতে না শেখান, ওকে যা করতে বলা হবে, ওকে যা বোঝানো হবে ও সবই মেনে নেবে। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আপনি সঠিকভাবে দিতে পারবেন এমন না। তবে চেষ্টা করতে ক্ষতি কী? ধৈর্য নিয়ে ওর প্রশ্নটা শুনুন আর উত্তর করার চেষ্টা করুন। উত্তর যদি না জানা থাকে তাহলে ওকে ভুলভাল বুঝিয়ে দেবেন না। এতে ও আরও বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। এর থেকে ওকে বলুন, 'আমি তো এটা জানি না ভাইয়া, আমি কালকে জেনে এসে তোমাকে জানাই?' ও কিন্তু ঠিকই আপনার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবে। আর আপনি যদি সত্যি সত্যি ওর প্রশ্নের সঠিক উত্তর নিয়ে পরদিন হাজির হন, তাহলে ও রাতারাতি আপনার ভক্ত হয়ে যাবে। কাজটা কি খুব কঠিন? মোটেই না।

'লোকে কী বলবে?' ভেবে যারা কোনো প্রশ্ন করছেন না, তাদের বলি, প্রশ্ন করার একটা খুবই ভালো দিক হচ্ছে, নিজের ব্র্যান্ডিংয়ের সুযোগ। কোনো ইভেন্ট, মিটিং কিংবা সেমিনারে যখন কেউ প্রশ্ন করার জন্য হাত তোলে এবং সঠিক প্রশ্নটি করে তখন সবার মনোযোগ ওই মানুষটার দিকে চলে যায়। ওই ইভেন্টের স্পন্সরের কথা যতজনের না মনে থাকবে তার চেয়ে বেশি আপনার কথা মানুষের মনে থাকবে। ইভেন্টের স্পন্সর কিন্তু কয়েক লাখ টাকা

খরচ করে ব্র্যান্ডিং করছে। একবার ভাবুন আপনার কত টাকার সেলফ ব্র্যান্ডিং হয়ে গেল। তাও আবার বিনা খরচে। যারা আপনাকে প্রশ্ন করা নিয়ে টিটকারি দিচ্ছে, দেখবেন তারা নিজেরাই ওই ক্লাস বা সেমিনার থেকে কিছু না বুঝে বা অর্ধেক জ্ঞান নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর তারা মনে মনে চাচ্ছে যে আপনিও তাদের দলে ভিড়ে যান, আর শুধু বোকার মতো মাথা নেড়ে ক্লাস শেষ করুন। এখন আপনিই ঠিক করুন, ওই মানুষগুলোর সাময়িক টিটকারি সহ্য করবেন, নাকি ওই ক্লাসের বিষয়বস্তু না বুঝে নিজের ক্ষতি করবেন।

যেই অল্পবয়সীরা এ লেখাটা পড়ছ তাদের বলছি, প্রশ্ন করা থামিয়ে দিয়ো না। যে যা-ই বলুক, এই প্রশ্নই তোমার সুপার পাওয়ার। অনেক প্রশ্নই আছে, যেগুলোর উত্তর তোমাকে কেউ দিতে পারবে না। আর সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়েই তুমি হয়ে উঠবে স্টিফেন হকিন্সের মতো বিজ্ঞানী, ওয়াসফিয়া নাজরিনের মতো দুঃসাহসিক অভিযাত্রী বা নিল আর্মস্ট্রংয়ের মতো মহাকাশচারী।

ভালো থেকো তোমরা, আর ভালো থাকুক তোমার বিশ্ব বদলে দেওয়া প্রশ্নগুলো।

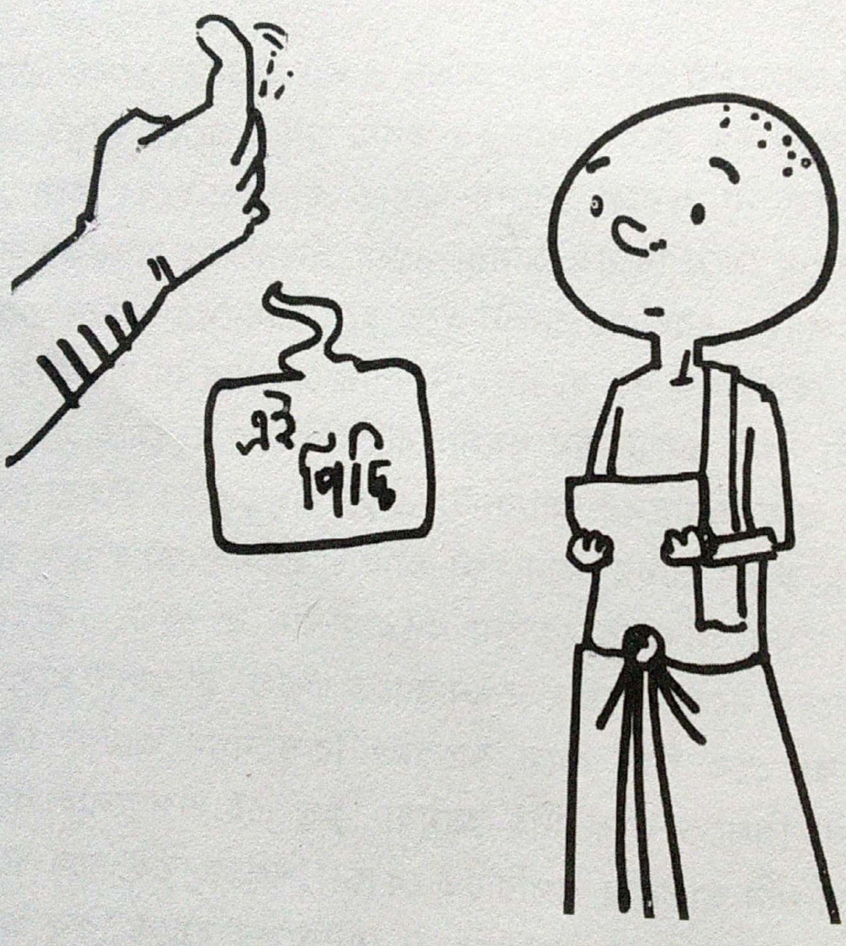
"He who asks is a fool for five minutes, but he who does not ask remains a fool forever."

– Mark Twain

এই পিচ্চি!

শিশুশ্রম আমাদের দেশে খুবই অপ্রিয় একটি বাস্তবতা হলেও এটাকে আইন করে বন্ধ করে দেওয়ারও উপায় নেই। অনেক শিশুই আছে যারা কাজ না করলে তাদের ক্ষুধার্ত থাকতে হবে। তবে, এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েও আমরা ওদের জীবনটাকে আরেকটু সুন্দর করতে পারি। এবং এর শুরুটা হতে হবে আমাদের আচরণ থেকে। কোনো হোটেলের বয় বা বাস-টেম্পোর হেলপার বা ভার্সিটির ফুল বিক্রেতা যখন একটু কম বয়সী কোনো ছেলে বা মেয়ে হয় তখন তাদের প্রতি আমাদের আচরণটা একটু অদ্ভুত হয়। আমরা খেয়াল করি না, কারণ আমরা মনে মনে ভাবি এ রকমই তো হওয়ার কথা। আপনি যখন আপনার কোনো বন্ধুর সন্তান বা ছোট ভাইবোনকে প্রথমবারের মতো দেখেন, তখন তাকে '*পিচ্চি*' বা '*ছোটু*' বলে ডাক দেন? বা ওকে শিস দিয়ে ডাকেন? কিন্তু যখন আমরা এই সব কর্মজীবী শিশুকে ডাক দিই আমরা কিন্তু এই শব্দগুলোই ব্যবহার করি। আপনি আপনার অপরিচিত কোনো শিশুকে 'তুই' বলে সম্বোধন করেন? অথচ বাসের হেলপার বা হোটেলের বয়কে কিন্তু প্রায়শই আমরা 'তুই' ডাকি। শুধু সম্বোধন না, ওদের সাথে কথাবার্তাও কেমন যেন রুক্ষ হয়। ফুল বিক্রি করা মেয়েটাকে '*যা, ভাগ এইখান থেকে*', টেম্পোর হেলপার ছোট ছেলেটা একটু বেশি ভাড়া চাইলে '*এই বয়সে চুরি শুরু করছস?*' এ ধরনের নানা কথা আমাদের নিজের কানে শোনা। আমরা হয়তো এই কথাগুলো কিছু না বুঝেই বলি। অথচ চিন্তা করুন, এই বাচ্চাটা জীবনে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে

একদিন বড় হবে। এই সমাজে আমাদের মতো যত মানুষ আছে তাদের প্রতি একটা ঘৃণা নিয়ে বড় হবে। ওর মনের মধ্যে থেকে যাবে যে এই সমাজের লোক সব সময় ওকে অপমান আর অবজ্ঞা করে এসেছে। কেউ এর প্রতিশোধ নিতে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়বে, কেউবা নিজেই রুক্ষ একটা মানুষ হয়ে উঠবে আর ওর আশপাশের মানুষের সাথেও খারাপ ব্যবহার করবে। অর্থাৎ প্রতিটি শিশুর সাথে আপনি যখন রুক্ষ আচরণ করেন, তখন আপনি ভবিষ্যতের একজন বদমেজাজী মানুষের জন্ম দেন।



অথচ এর সমাধানটা কিন্তু খুব সহজ। আমার বন্ধু ইয়াসিন আমাকে খুব সহজ একটা পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছে। ও কোনো হোটেলে এ রকম কোনো শিশুশ্রমিককে দেখলে বলে, ‘*এই যে বাবু, শোনো তো।*’ বাচ্চাটা খুব অবাক হয়ে কাছে আসে। ইয়াসিন আবার জিজ্ঞেস করে, ‘*তোমার নাম কী?*’ এই পর্যায়ে বাচ্চাটা হেসে দেয়। নরম করে নামটা বলে, ইব্রাহিম। ইয়াসিন বলে ‘*ইব্রাহিম, এককাপ চা*

নিয়ে আসো তো আমার জন্য।' বিশ্বাস করুন, ছেলেটা খুব খুশি মনে চা আনতে যায়। এটা ওর কাছে আর কাজ মনে হয় না, মনে হয় আপন কেউ চা খেতে চেয়েছে, তাকে চা খাওয়াতে হবে। খাবার অর্ডার করার পর ইব্রাহিমকে কয়েকবার নাম ধরে ডেকে এটা-ওটা চাওয়া হলো। ও একদম বিরক্ত হলো না। বরং যে কয়বার ওর নাম ধরে ডাকা হলো, ওর চোখ-মুখে একটা ঔজ্জ্বল্য দেখলাম। ওকে নাম ধরে ডাকলে ও এত খুশি হয় কেন জানেন? ওর নামটা ওকে একটা পরিচয় দেয়। একটা আত্মমর্যাদা দেয়। খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও ওর মনে হয় ও একজন হোটেল বয়ের থেকে বেশি কিছু, একজন শিশুশ্রমিকের থেকে বেশি কিছু। ও ইব্রাহিম। ওর নিজের একটা পরিচয় আছে।

আমাদের পথশিশুরা, আমাদের শিশুশ্রমিকেরা একটু শিক্ষা পেলে ভালো মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে। ওরাও ভবিষ্যতের দক্ষ নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। আর আমার আর আপনার ভালোবাসা পেলে ওরা *'পিচ্চি'* বা *'ছোটু'* না হয়ে একেকজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে বেড়ে উঠতে পারে।

একটা বাড়তি টিপস: আপনি যদি সবার প্রিয় হয়ে উঠতে চান, তাহলে এখন থেকেই অভ্যাস করুন সবার নাম মনে রাখার, আর কথা বলার সময় শ্রোতার নামটা বলার। কারণ, প্রত্যেক মানুষের কাছে তার সবচেয়ে প্রিয় শব্দ হলো তার নাম। আপনি যদি একজন মানুষের নাম মনে রাখেন এবং তার সাথে কথা বলার সময় সেটা ব্যবহার করেন তাহলে একটা সময় সেই মানুষটা নিজের অজান্তেই আপনার ভক্ত হয়ে যাবে। কাল থেকে রিকশাওয়ালা মামা, দোকানদার মামা, দারোয়ান মামাকে শুধু মামা না বলে তাদের নামটা জেনে নামের সাথে মামা যোগ করে সম্বোধন করুন। আর দেখুন কী আপ্যায়নটাই না পেয়ে যান!

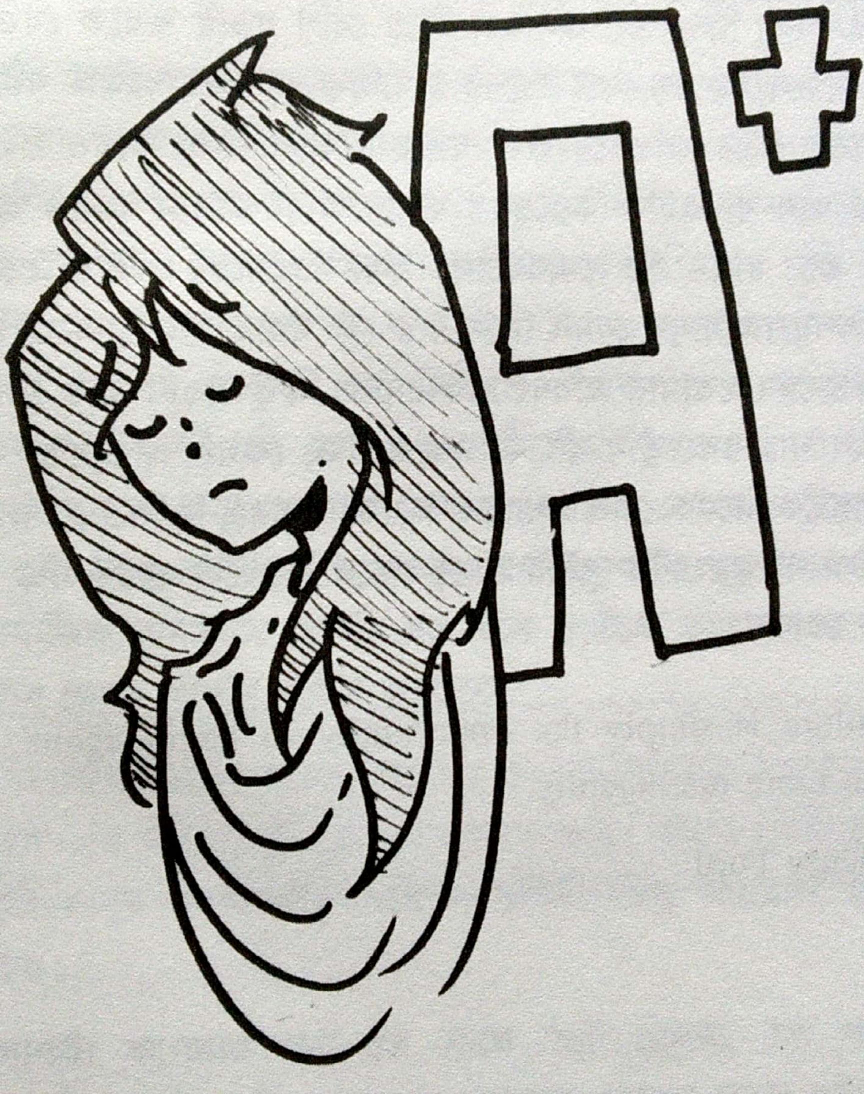
'We count by changes and events within us. Not by years.'

–Charles Dickens

A+ তো পাইলা না, এখন কী করবা?

২০১১ সালে যেদিন আমার এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট দেয়, সেদিন আমার বন্ধুরা সবাই বাসায় জিপিএ ৫ নিয়ে ফিরেছিল। আমি পারি নাই। আমি ৪.৭ নিয়ে ফিরেছিলাম। মাত্র ০.৩ পয়েন্টের জন্য আমি যেন লজ্জায়-অপমানে মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিলাম। এই ০.৩ পয়েন্টই যেন আমাকে দেশের তৃতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করেছিল। বাবা-মা হতাশ ছিলেন, কিন্তু আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে, তারা তাদের হতাশা আমাকে বুঝতে দেননি। আমাকে বকাঝকা তো দূরের কথা, হাতে টাকা দিয়ে ভাইবোনকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে আসতে বলেছিলেন। আমি যেদিন এইচএসসির রেজাল্ট পাই সেদিন হিসাব করে বুঝতে পারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০ নম্বরের যেই মূল্যায়ন তার মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে যেই ৮০ নম্বর, সেখানে আমার আছে মাত্র ৭০.২৮। আমার বেশির ভাগ বন্ধুরই তখন ৮০। আমি প্রায় ১০ নম্বর পিছিয়ে আছি। শতকরা হিসাবে সেটা মাত্র ৫ শতাংশ। তবুও মনে হলো আমি যেন যোজন যোজন পেছনে আছি। তাই ঠিক করলাম, বন্ধুদের তুলনায় দ্বিগুণ পড়তে হবে, দ্বিগুণ এফোর্ট দিতে হবে। বন্ধুরা সিনেমা দেখতে যাচ্ছে, আমি যাচ্ছি না। বন্ধুরা ঢাকার বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে আমি যাব না। মাথার পেছনে ওই ১০ নম্বরের পিছিয়ে থাকা। মনকে বুঝ দেওয়া, 'এই তিনটা মাস ভালোমতো খাটলে ওদের সাথে সব সময়ই ঘুরতে যাওয়া যাবে। মাত্র তো তিনটা মাস।'

জীবনে কোনো দিন এত এফোর্ট দিয়ে পড়িনি যত ওই তিন মাসে পড়েছি। সবই ওই ১০ নম্বর পিছিয়ে থাকার কল্যাণে। আমি এইচএসসির রেজাল্ট দেওয়ার আগে ভাবতেও পারিনি যে আমি ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম ২০০-এর মধ্যে থাকব। অথচ ১০ নম্বর পিছিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ১১৬তম হলাম। আর এর সব থেকে বেশি কৃতিত্ব আমি দিই ওই ১০ নম্বর পিছিয়ে থাকাকে। কচ্ছপ আর খরগোশের সেই গল্পটা মনে আছে? ওই ১০ নম্বর আমাকে দৌড়ের কচ্ছপ বানিয়ে দিয়েছে। স্লো অ্যান্ড স্টেডি। রেইস তো জিতবই, নাকি?



আজ ৯ বছর পার হয়ে গেছে। ৪.৭ আমার জীবনে এখন শুধু একটা সংখ্যা, এর থেকে বেশি কিছু নয়। আমি বলছি না, জীবনে অনেক বড় কিছু করে ফেলেছি বা স্টিভ জবস হয়ে গিয়েছি। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা বেশ

ভালোই রেখেছেন। 10 Minute School-এর মাধ্যমে তোমাদের মতো লাখ লাখ ভবিষ্যৎ সুপারস্টারের শিক্ষক হতে পেরেছি। আলহামদুলিল্লাহ।

দিনশেষে তোমার জিপিএ ৫ই হোক আর ৩ই হোক, সেটা তোমার জীবনটাকে নির্ধারণ করে দেবে না। আজকের পর সেটা তোমার জীবনেও একটা সংখ্যা হয়েই রয়ে যাবে। তোমার আগামীকালটা এখন তোমার হাতে। সেই লড়াইয়ের জন্য শুভকামনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: তোমার ফলাফল যদি জিপিএ ৫ হয়, তাহলে তোমাকে অভিনন্দন। কিন্তু এই ফলাফল নিয়ে বেশি বড়াই করতে যেও না। কখনো দেখেছ বড় কেউ তাদের মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে গর্ব করে কথা বলছেন কিংবা অন্য কারও ফলাফল নিয়ে ব্যঙ্গ বা কটূক্তি করছেন? কারণ তারা জীবনে আরও অনেক বড় বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে এসেছেন। আর তোমার আশেপাশের মানুষ যেমন জিপিএ ৫-কে মহাআরাদ্ধ সোনার হরিণ মনে করেন, তোমার ভবিষৎ চাকরিদাতা কিন্তু এতটা অতি মূল্যায়ন করেন না। বরং তুমি কী কী কাজে দক্ষ, কেমন অভিজ্ঞতা আছে এগুলোকে অনেক বেশি মূল্যায়ন করেন। সুতরাং জিপিএ ৫ সংক্রান্ত হতাশা বা অহংকার দুটোই ঝেড়ে ফেলে নিজেকে আরও দক্ষ করে গড়ে তোলো।

> "Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently."
>
> –Henry Ford

ছোট মুখে এত বড় কথা?

বেয়াদবি কাকে বলে? বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বড়দের মুখের ওপর কথা বলা বা বড়দের কথার মাঝখানে ছোট কারও কথা বলাটা বেয়াদবির একটা বড় উদাহরণ। আর তুমি যদি কখনো বয়সে বড় কারও ভুল ধরে ফেলো, তাহলে তো আর কথাই নেই। 'এত্ত বড় বেয়াদব', 'ছোট মুখে এত বড় কথা' ইত্যাদি। এ কথাটা শুধু বয়সে ছোটদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। অফিসে পদমর্যাদায় বা সামাজিক মর্যাদায় ছোট কেউ যদি কোনো কথার সোজা উত্তর দেয় বা নিজ মতামত প্রকাশ করে তাহলে আমরা সেটাকে বেয়াদবি হিসেবে নিই। এটা কিন্তু বড় ধরনের একটা বৈষম্যও বটে। শুধু পদমর্যাদা বা সামাজিক অবস্থানে আপনি বড় বলে কাউকে তার মতামতের অধিকার থেকে আপনি বঞ্চিত করছেন।

জাতি হিসেবে আমরা অন্যের মতামত দেওয়া জিনিসটা পছন্দ করি না। 'হ্যাঁ'-এর সাথে 'হ্যাঁ' মেলানো পছন্দ করি। কথার সাথে তাল মেলানো মানুষ পছন্দ করি। এই সংস্কৃতিটা কিন্তু আমাদের জন্য ক্ষতিকর।

যে লোকটা আপনার 'হ্যাঁ'-এর সাথে 'হ্যাঁ' মেলায়, সব সময় তোষামোদি করে, সে কিন্তু আসলে আপনার কোনো কাজে আসবে না। তার সাথে কথা বলে আপনি নতুন কোনো ধারণা পাবেন না। কিছু শিখতে পারবেন না। বরং যার মধ্যে আপনার কথাকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস আছে, ক্ষমতা আছে তার থেকে আপনি নতুন কিছু

জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন। কিন্তু তাই বলে ছোট কারও কাছ থেকে শিখব? অবশ্যই শিখবেন। ছোট কারও কাছ থেকে কিছু শিখলে আপনি কিন্তু ছোট হয়ে যাবেন না, বরং আপনারই লাভ হবে। প্রতিদিন এই পৃথিবীতে নতুন কিছু আবিষ্কার হচ্ছে। সুতরাং এই যুগে যে শিখবে না, সে আর এগোবে না। পরিষ্কার হিসাব।



এবার দেশের কথায় আসি। টেন মিনিট স্কুল থেকে আমরা যখন বাইরে কোথাও মিটিংয়ে যাই, তখন ইচ্ছা করে একটু ভারী জামা-কাপড় পরে যাই, যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে আমরা বয়সে বেশ ছোট। কারণ সেটা বুঝতে পারলে আমাদের আর সিরিয়াসলি নেবে না। এই যে দিনের পর দিন দেশের তরুণ প্রজন্মের মতামতকে

অবজ্ঞা করা হচ্ছে, তরুণদের অবুঝ ভেবে একপাশে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তাতে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ কোনোটারই কি লাভ হচ্ছে? স্টিভ জবস মাত্র ২১ বছর বয়সে অ্যাপল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আলেকজান্ডার দি গ্রেট ২৫ বছর বয়সে গোটা বিশ্ব শাসন করেছিলেন। আর আমাদের দেশে এই বয়সের কেউ কোনো আইডিয়া নিয়ে এলে আমরা বলি '*তুমি কী বোঝো? ছোট মানুষ, চুপ থাকো।*'

আরেকটা উদাহরণ দিই। খালেদ মাহমুদ সুজন একসময়কার দেশসেরা অলরাউন্ডার। দেশের ক্রিকেটের উন্নয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এখন চিন্তা করুন, তিনি যদি একদিন সাকিব আল হাসানকে বলেন, 'তুমি কী জানো? ছোট মানুষ চুপ করে থাকো।' তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয়। দেশের যেকোনো শিল্পে নতুন প্রজন্ম যদি আগের প্রজন্ম থেকে আরও বুদ্ধিদীপ্ত না হয়, আরও আধুনিক না হয়, তাহলে এটা কিন্তু ওই শিল্পেরই ব্যর্থতা। আর আমরা যদি সেই বুদ্ধিদীপ্তি, সেই আধুনিকত্বকে স্বাগত না জানাই, তাহলে সেই শিল্প আগাবে কীভাবে?

বয়সের সাথে সাথে অভিজ্ঞতা আসে, সেটা অস্বীকার করি না। তবে তরুণদের মধ্যে যে বুদ্ধির অভিনবত্ব আছে, যেই উচ্ছ্বাস আছে, সেটা আপনি কোথায় পাবেন? দেশের সব ক্ষেত্রে নবীন-প্রবীণ, ছোট-বড় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারলে দেশটা কোথায় যাবে ভাবতে পারেন?

বোনাস টিপস: ছোট হয়েও কিছু ক্ষেত্রে পাত্তা পাওয়ার কয়েকটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিই! আমাদের তো এগুলো বেশ কাজে দিয়েছে। আশা করি আপনাদেরও কাজে লাগবে—

১. পাঞ্জাবি পরতে পারেন। কারণ এতে একটুখানি প্রাপ্তবয়স্ক দেখায়।

২. পকেটে নিজের কার্ড রাখবেন। এতে বেশ পেশাদার মনে হয়।

৩. মিটিংয়ের সময় সামনে খাতা-কলম রাখুন। বেশ প্রো-অ্যাকটিভ মনে হবে।

৪. কথার ফাঁকে সামনের মানুষটির প্রশংসা করলে আপনার নিজের ম্যাচুরিটির অনেকখানি বহিঃপ্রকাশ ঘটে তবে এক্ষেত্রে খুব বেশি তেলতেলে ভাব বা তোশামদি করা ঠিক হবে না।

৫. কথার ফাঁকে ঠাট্টার ছলে বয়সে ছোট বিধায় যে অনেক সময় অনেকের কাছে পাত্তা কম পান সেটাও বলে ফেলতে পারেন এতে করে সেও আপনাকে ছোট বলে বাতিল করে দেওয়ার আগে দুইবার ভাববে।

তোকে নিয়ে কত আশা করসিলাম...!

তোকে নিয়ে কত আশা করসিলাম তুই ডাক্তার হবি, তুই আমার কোনো স্বপ্নই পূরণ করতে পারলি না!

একজন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার্থীর মাথায় পরীক্ষার আগমুহূর্তে কোন কথাগুলো ঘোরা উচিত? ‘*ভালোমতো পড়েছি তো? কেমিস্ট্রিটা আরও পড়লে ভালো হতো। ডাক্তার আমাকে হতেই হবে।*’ কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থীর মাথায় ঘোরে ‘চান্স না পেলে মা অনেক কষ্ট পাবে। আব্বু তো রেগে বাসা থেকেই বের করে দেবে। আমি বাবা-মার স্বপ্ন পূরণ করতে পারব তো?’ আমাদের দেশের বেশির ভাগ যুবক-যুবতী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে চান নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে বা জীবনে বড় কিছু হওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, বরং শুধু বাবা-মার স্বপ্ন পূরণ করতে। একদম ছোটবেলাতেই এই স্বপ্নের দায় তাদের ছোট্ট ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়।’ *তোমাকে ডাক্তার হতেই হবে তোমাকে ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে।*’ এরপর চলে সেই স্বপ্ন মোতাবেক শিশুর জীবনের ওপর স্টিম রোলার চালানো। স্কুলের বাচ্চাকে ৫-৬টা কোচিংয়ে ভর্তি করানো, খেলাধুলা-কার্টুন দেখা বাদ দিয়ে ৭-৮ ঘণ্টা পড়ার চাপ, এরপর ক্লাস নাইনে বিষয় নির্বাচনের সময় এলে ছেলে অঙ্ক পারুক আর না পারুক তাকে জোর করে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করিয়ে দেওয়া। এইচএসসি পাস করার পর এই স্বপ্নের স্টিম রোলারের গতি যেন আরও বেড়ে যায়। মেয়ের গ্রাফিক্স ডিজাইনিংয়ে প্রচুর ঝোঁক, তবুও ডাক্তার হতেই হবে। ছেলের

ইচ্ছা উদ্যোক্তা হওয়ার। কিসের কী, ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে। এবার দুই-তিনটা ভর্তি কোচিং ঘেঁটে, তিন-চারটা গাইড বেটে জোর করে খাইয়ে দেওয়া হবে সেই নিরীহ বালক-বালিকাকে। সবই ওই স্বপ্নের নাম করে। অথচ ওই ছেলে-মেয়েটার নিজেরও যে কিছু স্বপ্ন থাকতে পারে সেটা অনেকে ভুলেই যায়।



বাবা-মার স্বপ্ন আর প্রত্যাশার চাপে বেশির ভাগ ছাত্রই মুখ থুবড়ে পড়ে। এমনকি অনেকে নিজ থেকে এগুলো পড়তে চাইলেও বাবা-মার বাড়াবাড়ির কারণে আরও বেশি নার্ভাস হয়ে পড়ে। সব থেকে ভয়াবহ অবস্থা হয় যারা অপ্রিয় বিষয়গুলো নাকেমুখে গিলে মনের

বিরুদ্ধে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায় তাদের। বেচারাদের সারা জীবন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের অভিনয় করতে হয়। আর তাদের মনের ভেতর আটকে থাকা সাহিত্যিক, উদ্যোক্তা বা শিক্ষকেরা মনের ভেতরেই আত্মহত্যা করে।

আমি জানি, প্রত্যেক বাবা-মাই তার সন্তানের ভালো চান। কিন্তু আপনার স্বপ্নের বিষয় বা পেশা আপনার সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ না-ও হতে পারে। দেখুন ও কী করতে চায়, কী পড়তে চায়। ওর প্যাশনই ওকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বাইরের পৃথিবীতে এমনিতেই অনেক চাপ ওর জন্য অপেক্ষা করছে। মারমার কাটকাট প্রতিযোগিতা, সুযোগের সংকট, সমাজের তিরস্কার আরও কত-কী। এর ওপর আবার আপনার স্বপ্ন আর প্রত্যাশার ভারটা ওর ওপর চাপিয়ে দেবেন না। বরং ওর স্বপ্নগুলোকে নিশ্বাস নিতে দিন।

ভালো থাকুক আপনার সন্তান। ভালো থাকুক ওর স্বপ্নগুলো।

> "The only way to do great work is to love what you do."
>
> –Steve Jobs

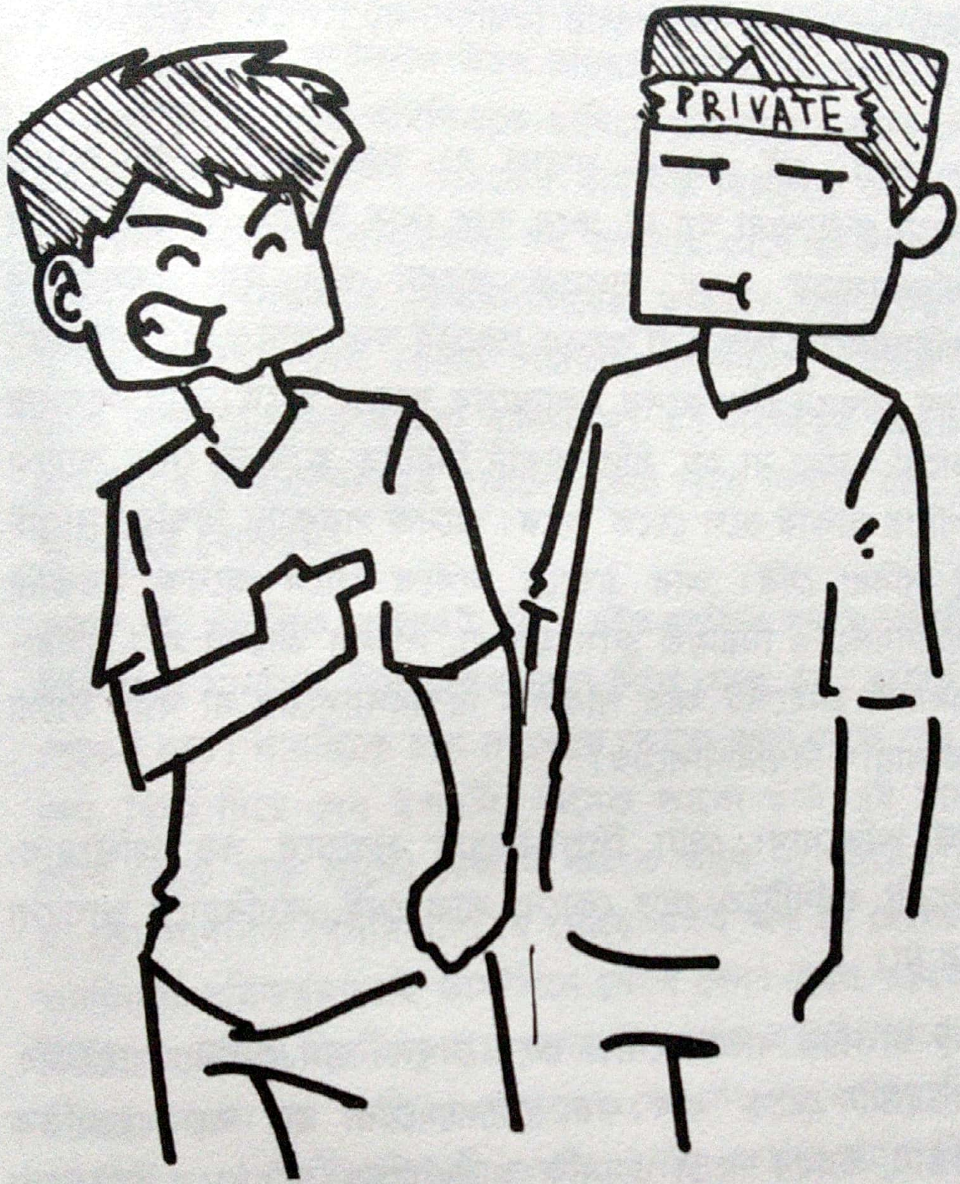
এত ভাব নাও কেন? পড়ো তো প্রাইভেট ভার্সিটিতে!

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় শুনলেই নাক সিটকানোর অভ্যাস আছে এ দেশের বেশির ভাগ মানুষের। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে শুনলে ধরেই নেয় এটা খারাপ ছাত্র; এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বাইরের মানুষের হাজারটা অভিযোগ ওদের নিয়ে। এরা বাপের টাকা নষ্ট করে, এদের মেধা নেই, প্রাইভেটে পড়লে চাকরি পাওয়া যায় না, এসব ভার্সিটিতে পড়াশোনা হয় নাকি? প্রাইভেটের ছেলেরা বেয়াদব হয়, আল্ট্রা মডার্ন হয়– আরও কত-কী। এই লেখায় এ রকম কয়েকটা অভিযোগের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করি।

প্রথম অভিযোগ: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাবার টাকা নষ্ট করছে।

প্রথমত, শিক্ষার জন্য টাকা ব্যয় করাটাকে আমরা কেন টাকা নষ্ট করা বলি তা আমার বোধগম্য হয় না। একটা বিবিএ ডিগ্রি পাস করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছরে ৬ থেকে ৮ লাখ টাকা লাগে। অনেক পরিবারই নিজেদের গাড়ি কেনার পেছনে এর থেকে বেশি টাকা খরচ করেন। যেই গাড়িটা ১০ বছরও চলে না। অথচ আপনার সন্তান যদি সুশিক্ষা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হতে পারে তাহলে সে সারা জীবন মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমার পরিচিত অনেকেই তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফির আংশিক বা পুরোটা নিজে জোগাড় করে। টিউশনি করে, পার্টটাইম চাকরি করে। অনেকেই ‘কীভাবে বাবা-মার ঋণ শোধ

করব' এই চিন্তায় ভুগতে থাকে। সুতরাং তারা ইচ্ছামতো বাবা-মার টাকা ওড়াচ্ছে এ কথাটা ঠিক নয়।



দ্বিতীয় অভিযোগ: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা উচ্ছৃঙ্খল হয়।

এই অভিযোগটা রীতিমতো হাস্যকর। কারণ উচ্ছৃঙ্খলতার সাথে পাবলিক-প্রাইভেটের কোনো সম্পর্ক নেই। কেন? সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মারামারি হয় না? র‍্যাগিং হয় না? তাই বলে কি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা উচ্ছৃঙ্খল? মোটেই না। সব বিশ্ববিদ্যালয়েই শৃঙ্খল ও উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র উভয়ই রয়েছে। বরং

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন অনেক সময় উচ্ছৃঙ্খলতা প্রতিরোধ করতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে বেশি তৎপর থাকে।

তৃতীয় অভিযোগ: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা হয় না।

ভুল কথা। হ্যাঁ, অনেক খারাপ বা ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেখানে পড়াশোনা হয় না, তবে তার দোষ আপনি সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপাতে পারেন না। বরং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রেই বরং আরও বেশি দায়বদ্ধ। কারণ সেখানে শিক্ষকদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা আছে। যদি আপনার পড়ানো ভালো না হয়, যদি আপনি নিয়মিত ক্লাস না নেন, তাহলে আপনার চাকরি চলে যেতে পারে। অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই এই সুবিধা নেই। আর এভাবে দেখতে গেলে অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও নিয়মিত ক্লাস হয় না, শিক্ষক আসেন না। সুতরাং ব্যবধানটা প্রাইভেট আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের না বরং ভালো আর খারাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের।

চতুর্থ অভিযোগ: যেটা পিতা-মাতার সবচেয়ে বড় অভিযোগ; প্রাইভেট ভার্সিটিতে পড়ে কোনো লাভ নেই, ক্যারিয়ারে আগানো যাবে না।

একটু চাকরির বাজার খোঁজ করে দেখুন। এনএসইউ, আইইউবি, আইইউটি থেকে পাস করা ছেলেমেয়েরা বড় বড় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থা এমনকি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। অনেক জায়গাতেই তারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের থেকে বেশি ভালো করছে। দিনশেষে আপনার যোগ্যতা, আপনার দক্ষতা আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যান্ডের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ চাকরিদাতার কাছে। আন্তবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতাগুলোর কথা বলবেন? বিতর্ক প্রতিযোগিতার কথা বলি। ২০১১ সালে বাংলাদেশের কোনো দল প্রথমবারের মতো বিতর্কের বিশ্বকাপে (Worlds University Debating Championship)

নকআউট পর্বে প্রবেশ করল। সবাইকে চমকে দিয়ে সেই দলটি চ্যাম্পিয়নও হয়ে গেল। সেই দলটি ছিল ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের। আবার ২০১৮ সালে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে (United Asian Debatign Chamionship) ফাইনালে উঠল বাংলাদেশেরই দুই দল। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করল আইইউবি। বিতর্কের বাইরেও বিজনেস কম্পিটিশন, প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট, রোবটিকস, সব জায়গায় দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। চন্দ্রাবটের নাম শুনেছেন? চাঁদে যেই রোবট পাঠাচ্ছে বাংলাদেশ, সেটাও কিন্তু ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বানিয়েছে। এই সবকিছুর পরেও যদি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ছোট করে দেখতে চান, সেটা আপনারই বোকামি।

অথচ এই পাবলিক-প্রাইভেট নিয়ে এইচএসসির পর ছাত্রছাত্রীদের রীতিমতো মানসিক নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। বুয়েটে চান্স পেতেই হবে। পাবলিকে চান্স না পেলে তোকে বাসা থেকে বের করে দেব, বিয়ে দিয়ে দেব ইত্যাদি। অনেক ভালো ছাত্র এই মানসিক চাপে ভেঙে পড়ে ভালো রেজাল্ট করতে পারে না। অনেক বাবা-মা তো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহে এতই অন্ধ যে ছেলেমেয়ের ক্যারিয়ার পরিকল্পনাকেই ডাস্টবিনে ফেলে দেন। ছেলে পড়তে চায় বিবিএ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর লোভে হয়তো তাকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় পালি ও সংস্কৃতে। সে এটা পড়তে চায় কি না, এটা পড়ে সে ভবিষ্যতে কী করবে, সেটা কোনো ব্যাপারই না। পাবলিকে পড়লেই হলো।

বাবা-মার কাছে অনুরোধ, ছেলেমেয়েকে এ ধরনের মানসিক চাপের মুখে ফেলবেন না। আপনার সন্তান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুক আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ুক সে যেন তার মনের মতো বিষয়ে পড়তে পারে। তাকে অপরাধবোধে ভোগাবেন না, বরং উৎসাহ দেবেন। দেখবেন, সে নিজ অবস্থান থেকে দারুণ কিছু একটা করে দেখিয়েছে।

যেসব গর্বিত ঢাবিয়ান আর গর্বিত জাবিয়ান শুধুমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অহংকারে কথায় কথায় সবাইকে ‘আগে চান্স পেয়ে দেখা’ বলছেন, আপনাদের এ ভ্রান্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হলেই ভাঙবে। প্রতিষ্ঠানের গৌরবে যদি মনে করেন ঢাবি, জাবি বা বুয়েট থেকে পড়লেই চাকরি পেয়ে যাবেন– তবে নিজের জন্য মহাবিপদ ডেকে আনছেন। আর যে মানুষটিকে আগে চান্স পেয়ে দেখান বলে খেপাচ্ছেন, হয়ত সে মাত্র একটা অবজেকটিভ ভুল দাগানোর জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারেননি। তার মানে এই না যে সে আপনার থেকে কম মেধাবি।

আর যারা আশপাশের মানুষের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত আস্ফালনে বিরক্ত, তাদের বলি, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যুদ্ধ করা বা এটা নিয়ে অহংকার করা খুবই বোকামি। এটা কেউ করলে মনে মনে তার বোকামি নিয়ে হাসা ছাড়া আসলে আর কিছুই করার প্রয়োজন নেই। বরং ওই সময়ে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের চার বছরের রণকৌশল নিয়ে চিন্তা করো। কয়টা টিউশনি করবে, কোথায় কোথায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করবে, সিভিটা কবে লিখে ফেলবে, ইংরেজির দক্ষতাটা কবে শাণিয়ে নেবে, কর্পোরেটের মানুষজনের সাথে কবে থেকে নেটওয়ার্কিংয়ের কাজ শুরু করবে এসব খাতায় কলমে লিখে নিজের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলো। আর বোকাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নিয়ে গর্ব করে ফেসবুকে পোস্ট দিতে দাও।

> “Education is not just about going to school and getting a degree. It’s about widening your knowledge and absorbing the truth about life.”
>
> –Shakuntala Devi

এসব এখন বাদ দিতে হবে!

বিতর্ক-কুইজ এগুলো ছোটবেলায় ঠিক আছে। তুমি এখন বড় ক্লাসে, এসব এখন বাদ দিতে হবে!

ছোটবেলায় একটা গল্প শুনেছিলাম। তিন চাপাবাজ বন্ধু আড্ডা দিচ্ছে।

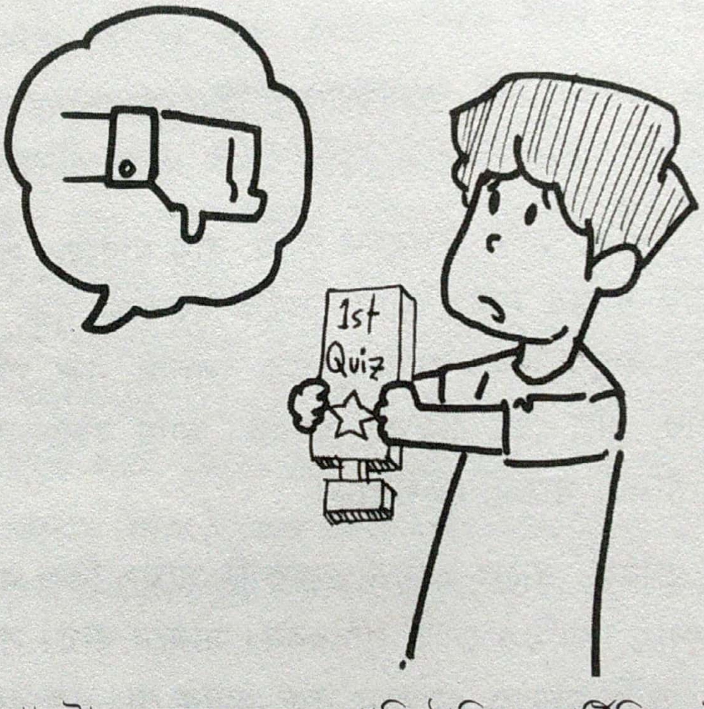
প্রথম বন্ধু— দোস্ত, আমি সুন্দরবন গেসি, বাঘ মারতে। সামনে বাঘ। সাথে আমার চাকর নুরু। আমি নুরুকে বললাম, নুরু, বন্দুক দে। নুরু আমাকে বন্দুক দিল। আমি নুরুকে বললাম, নুরু, গুল্লি দে। নুরু বলল, ওস্তাদ, গুল্লি তো রাইখ্যা আসছি। আমি বন্দুকের বাঁট দিয়া বাইড়াইয়া বাঘটা মাইরা ফেললাম।

দ্বিতীয় বন্ধু ভাবল, তাকে আরও এককাঠি সরেস কিছু বলতে হবে। সে বলল, দোস্ত, আমিও গেসি সুন্দরবন। সামনে বাঘ। সাথে আমার চাকর নুরু। আমি নুরুকে বললাম, নুরু, বন্দুক দে। নুরু বলল, ওস্তাদ, বন্দুকই তো রাইখ্যা আসছি। আমি বললাম, নুরু, তোর স্যান্ডেলটা দে। আমি স্যান্ডেল দিয়ে বাইড়াইয়া বাঘটা মেরে ফেললাম।

তৃতীয় বন্ধু একটু বিপদে। কীভাবে নিজেকে সবচেয়ে সাহসী প্রমাণ করা যায়? সে বলল, দোস্ত, আমিও গেসি সুন্দরবন। সামনে বাঘ। সাথে আমার চাকর নুরু। আমি নুরুকে বললাম, নুরু, বন্দুক দে। নুরু বলল, ওস্তাদ, বন্দুক তো রাইখ্যা আসছি। আমি বললাম, নুরু, তোর স্যান্ডেলটা দে। নুরু বলল, ওস্তাদ, স্যান্ডেলও তো রাইখ্যা আসছি। আমি বললাম, নুরু, ওই বন্দুকের লাইসেন্সটা আছে না? ওইটা দে।

আমি লাইসেন্সটা বাঘকে দেখায়ে বললাম, এই বাঘ, দেখ। এইটা থ্রি নট থ্রি রাইফেলের লাইসেন্স। বাঘ লাইসেন্স দেখে হার্ট ফেইল করে মরে গেল।

বাস্তব জীবনেও আমরা অনেকেই এ রকম প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছি। শিক্ষাজীবনে আমরা অনেকগুলো লাইসেন্স (সার্টিফিকেট) জোগাড় করছি। জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসিতে জিপিএ ৫। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিজিপিএ ৩.৮। হয়ে গেল অনেকগুলো সার্টিফিকেট। অনেকগুলো লাইসেন্স। এবার খালি ইন্টারভিউ রুমে ঢুকে প্রশ্নকর্তার মুখের সামনে এই লাইসেন্সগুলো ধরলেই তিনি ভয়ে আপনাকে চাকরি দিয়ে দেবেন।



আসলে ব্যাপারটা এ রকম নয়। প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেট অবশ্যই দরকার। তবে এগুলো দিয়েই চাকরি পাওয়া যাবে বা জীবন পার করে দেওয়া যাবে– এই প্রত্যাশা করাও ঠিক হবে না। বনের বাঘকে মারতে যেমন বন্দুক আর গুলি প্রয়োজন, বাস্তবিক জীবনেও ভালো চাকরি পেতে হলে, ভালো কিছু করতে গেলে অবশ্যই দক্ষতা থাকা দরকার। এবং ঠিক এখানেই সহশিক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব। পেশাগত জীবনে কী কী লাইফ স্কিল দরকার আর সেগুলো অর্জন করতে সহশিক্ষা কার্যক্রম আপনাকে বা আপনার সন্তানকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে তা একটু দেখে নিই।

কমিউনিকেশন স্কিল বা যোগাযোগ দক্ষতা: বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাগুলোর একটি। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এখনো এই দক্ষতা গড়ে তোলার সুযোগ নেই। এর জন্য আপনাকে বিতর্ক, মডেল ইউনাইটেড ন্যাশনস বা বিজনেস কম্পিটিশনের দিকে যেতে হবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলি। আমরা দুজন (আয়মান ও সাকিব) কিন্তু স্কুলজীবনে বেশ বোকাসোকা ছিলাম। বিতর্ক, বিজনেস কম্পিটিশন, কুইজ এগুলো না করলে হয়তো আজকে এই সব ভিডিও বানানো, উদ্যোক্তা হয়ে ওঠা বা এমনকি এই বই লেখাও সম্ভব হয়ে উঠত না।

লিডারশিপ স্কিল বা নেতৃত্ব দক্ষতা: বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো লিডার কে? সবাই এককথায় মেনে নেবে, মাশরাফি বিন মর্তুজা। খেলার মাঠে, বিতর্কের মঞ্চে বা বিজনেস কম্পিটিশনের প্রস্তুতির সময় নেতৃত্ব অনুশীলনের যে সুযোগ পাওয়া যায়, তা ক্লাসরুমের ভেতর কখনোই সম্ভব না।

তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের দক্ষতা: ক্লাসরুমে সাধারণত প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আপনার অনেক সময় থাকে। অনেক প্রস্তুতি থাকে। কিন্তু বিতর্ক, কুইজ বা খেলাধুলায় এমন অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয় যার জন্য আপনি প্রস্তুত ছিলেন না। এমন কিছু সমস্যা সমাধান করতে হয় যেগুলো আপনি আগে কখনো করেননি। ধরুন, আপনি বিতর্ক করছেন। আপনাকে বিতর্কের বিষয় দেওয়া হলো আমেরিকার রাজনীতি বিষয়ে। এখন হঠাৎ করে আপনাকে একজন মার্কিন নাগরিকের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতে হবে। একটা মার্কিন সমস্যা, যেটা নিয়ে আপনি কখনো চিন্তা করেননি, সেটা আপনাকে সমাধান করতে হবে। একই কাজ আপনাকে মডেল ইউনাইটেড ন্যাশনসেও করতে হবে। আপনি বিজনেস কম্পিটিশনে গেলে আপনাকে কোম্পানির সিইও থেকে রাস্তার ঝালমুড়িওয়ালা পর্যন্ত সবার মতো করেই ভাবতে হবে। এত বিস্তৃত চিন্তার খেলাঘর শ্রেণিকক্ষের চার দেয়ালের মধ্যে সম্ভব?

তবে বিতর্ক বা বিজনেস কম্পিটিশন থেকে আমরা দুজন কোন জিনিসটা সব থেকে বেশি শিখেছি জানেন? আমরা হারতে শিখেছি। পরাজয় হজম করতে শিখেছি। হয়তো ভাবছেন হারতে শেখা কি ভালো কিছু নাকি? জীবনে সবগুলো প্রতিযোগিতায় আপনি জিতবেন না এবং হেরে যাওয়া মানেই থেমে যাওয়া নয়, এটা কিন্তু জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা শিক্ষা। একের পর এক প্রতিযোগিতায় হেরেও যখন আমরা বিতর্ক আর বিজনেস কম্পিটিশন ছেড়ে দিইনি, তখনই আমরা বাকি জীবনের জন্য 'হেরে গেলেও থেমে যাব না' মন্ত্রটা শিখে ফেলেছি। এখন কর্মজীবনে প্রবেশ করে এই মন্ত্র যে কী পরিমাণ কাজে লাগছে তা বলে বোঝাতে পারব না।

চাকরির ইন্টারভিউতে পড়ালেখা কিন্তু একটা নম্বর দিয়েই বুঝিয়ে দেওয়া যায়। জীবনে আর কী করেছ সেটা নিয়ে প্রশ্ন করলে কিন্তু খুব একটা পড়াশোনার কথা আনা যায় না। আর তাই তোমার মধ্যে কী বিশেষত্ব আছে বা জীবনে তুমি কী করেছ বা কী তোমাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে সেটার উত্তরে চুপ হয়ে থাকতে হবে যদি না তুমি কোনো সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নাও।

আবারও বলছি। এই লেখায় আমরা কোনোভাবেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্বকে ছোট করতে চাই না। কিন্তু সহশিক্ষা কার্যক্রমগুলোও ঠিক একই সাথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যারা ভাবছেন বড় ক্লাসে উঠে গেলে এগুলো পড়াশোনার চাপে ছেড়ে দিতে হবে, তাদের বলতে চাই, বরং বড় ক্লাসে এই স্কিলগুলো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আপনার সন্তান যদি কোনো রকম স্কিল ছাড়া কেবলমাত্র অনেকগুলো সার্টিফিকেট নিয়ে বেড়ে ওঠে, তাহলে ওর অবস্থাও বন্দুকবিহীন শিকারির মতো হতে পারে।

> "Many activities and team play participation will give you a training that will prove invaluable later on in life."
>
> —Walter Annenberg

গল্পের বই বাদ দিয়ে পড়ার বই পড়ো!

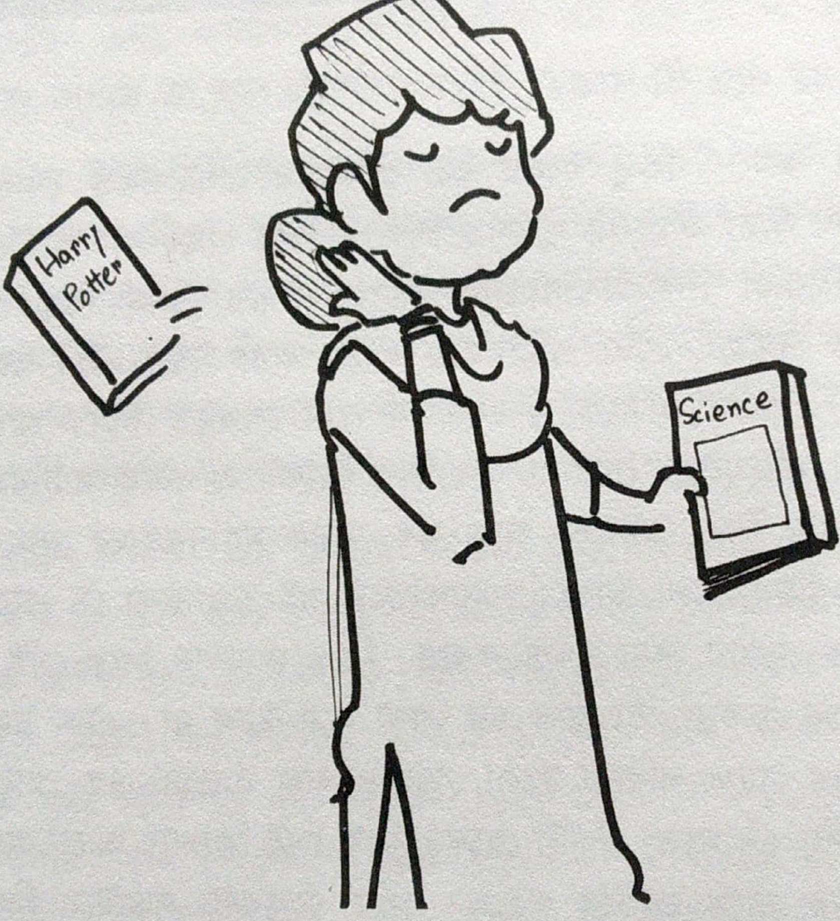
গল্পের বই পড়ে কী লাভ?

কখনো কখনো কিছু গল্পের বই আমাদের এমন কিছু শেখাতে পারে যা সারা জীবনের পুঁথিগত শিক্ষাও দিতে পারে না। আমাদের সাহিত্যিকেরা শিশু-কিশোরদের মনের ভেতর এমন কিছু ছবি আঁকতে পারেন, যেটা পাঠ্যবইয়ে ধারণ করা সম্ভব নয়। ধরুন, আপনি একজন ছাত্রকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে শেখাতে চান। আপনি চান সে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত হোক। আপনার পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের দিন, তারিখ, আর সব নায়ক-মহানায়কের নাম ও তাদের কীর্তি লেখা আছে। পাঠ্যবইয়ের এই তথ্যগুলো সে পড়ছে, পরীক্ষায় লেখার জন্য মুখস্থ করছে। কিন্তু মাঝখান দিয়ে সেই যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, তা আর ওর শেখা হয়ে উঠল না। এমন সময়ে ধরুন ওর সাথে পরিচয় হলো, 'আমার বন্ধু রাশেদ'-এর। রাশেদ ওর বয়সী, ওর মতো একটা ছেলে। দুরন্ত সেই কিশোর আস্তে আস্তে মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। দুর্ধর্ষ একেকটা লড়াইয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনছে। এবার আমাদের সেই ছাত্রের জন্য মুক্তিযুদ্ধ কেবল কিছু দিন-তারিখ আর মানুষের নাম না। এটা একটা জলজ্যান্ত গল্প। ওর বন্ধু রাশেদ-এর গল্প। ও আস্তে আস্তে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবটা বুঝতে শেখে, আনন্দ-বেদনাগুলো বুঝতে শেখে।

এ ব্যাপারটা আরও বেশি ঘটে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। আপনি একজন ছাত্রকে যতই জোর করে এ প্লাস বি হোলস্কয়ার শেখান, সে যদি

নিজে থেকে অনুসন্ধিৎসু আর বিজ্ঞানপিপাসু হয়ে বেড়ে না ওঠে, তাহলে সকল অঙ্ক-বিজ্ঞান পড়াই বৃথা। আপনি যদি ওকে সায়রা সায়েন্টিস্ট বা প্রফেসর শংকুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন, তাহলে সে শুধু বিজ্ঞান পড়বে না, বিজ্ঞানকে ভালোবাসবে।

একটা ছোট্ট পরীক্ষা হয়ে যাক। পরীক্ষার জন্য তো অনেক পাঠ্যবই পড়েছেন। পরীক্ষা পাস করে এ প্লাসও পেয়েছেন। এখন বলুন তো আগের পড়া কয়টা বইয়ের ঠিক কয়টা জিনিস মনে আছে?



এই তো আটকে গেলেন, তাই না?

আটকে যাওয়ার কারণটা খুবই সোজা। কারণ এই বইগুলো আমরা আসলে পড়ার থেকে পরীক্ষায় পাস করার জন্য বেশি পড়েছি। জীবনের পরীক্ষায় পাঠ্যবইয়ের চেয়ে বাকি বইগুলোর কথা তুলনামূলক বেশি মনে থাকে। আর যেহেতু মনে বেশি থাকে তাই কাজেও বেশি লাগে।

আমাদের সত্যজিৎ রায়, আমাদের জাফর ইকবাল, আমাদের আনিসুল হক, শিশু-কিশোরদের জন্য সীমাহীন একটা কল্পনার জগৎ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। আমাদের শিশু-কিশোরেরা এই জগতে হারিয়ে যাক। সেখানেই তারা নিজেদের মধ্যে ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী আর শিল্পীদের খুঁজে পাবে।

> "Reading is a way for me to expand my mind, open my eyes & fill up my mind."
>
> – Oprah Winfrey

এই প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। আমরা সব সময় এ কথাটা শুনি। আমাদের নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে সরে যাচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হারিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি কথা সবাই বলে। কিন্তু কেউ বলে না মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জিনিসটা কী।

তাহলে আসলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জিনিসটা কী?

পাকিস্তানকে ঘৃণা করা? নাহ। পাকিস্তান একটা ব্যর্থ রাষ্ট্র। আপনি ঘৃণা করেন আর ভালোবাসেন, এতে পাকিস্তানের কিছুই যায়-আসে না। আর বাংলাদেশের তো কিছু যায়-আসেই না। অনেকে পাকিস্তানের সাথে ক্রিকেট খেলায় বাংলাদেশ জিতলে বলে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিজয় হয়েছে। তাহলে যেদিন বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছে হেরে যায়, সেদিন কী হয়? মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হেরে যায়? মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এত ঠুনকো?

তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটা কী? মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক যাবতীয় দিন-তারিখ, নাম, নামের বানান মুখস্থ করে ফেলা? আপনি যদি সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী হন বা একজন গবেষক হন, তাহলে আপনি এ তথ্যগুলো মুখস্থ করে ফেলতেই পারেন। আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে এটা ভাবার কারণ নেই যে এগুলো মুখস্থ করলেই আপনি বিশাল দেশপ্রেমিক আর এগুলো না জানলেই আপনি দেশদ্রোহী বা আপনার মধ্যে কোনো দেশপ্রেম নেই। আমার গ্রামে এমন অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছেন যারা মুক্তিযুদ্ধের এসব দিন-তারিখ-নাম কিছুই

বলতে পারবেন না। তবুও তারা শেখ মুজিবুর রহমানের এককথায় জীবন দিতে রাজি ছিলেন। তাদের থেকে নিশ্চয়ই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বেশি শক্তিশালী নয়।

তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কী?

আমার কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানে চারটি শব্দ। হাল-ছেড়ে-দেব-না।

১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় পাকিস্তান সেনাবাহিনী তখন বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত তাদের সামরিক শক্তির জন্য। অস্ত্রশস্ত্রের জন্য। আর অন্যদিকে আমাদের কোনো সেনাবাহিনীই ছিল না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে কিছু বাঙালি সৈনিক বেরিয়ে এসেছিলেন আর কিছু পুলিশ আর ইপিআর সদস্যের হালকা সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল। এর বাইরে মুক্তিবাহিনীর সিংহভাগই আমজনতা। কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী।

চিন্তা করতে পারেন, কী পরিমাণ সাহস, কী পরিমাণ কলিজা লাগে এ রকম একটা যুদ্ধে জড়াতে? আপনি সারা জীবন হালচাষ করেছেন, ছাত্র পড়িয়েছেন, গিটার বাজিয়েছেন। এখন আপনি বের হয়ে গেলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর সাথে লড়াই করতে। কী পরিমাণ সাহস লাগে চিন্তা করতে পারেন? তবে আরেকটা জিনিস লাগে। একটা প্রতিজ্ঞা। হাল ছেড়ে দেব না। যতই কঠিন লড়াই হোক, যতই অসম্ভব হোক, হাল ছেড়ে দেব না।

শহীদ আজাদের মা যখন আজাদের সাথে শেষবারের মতো থানায় দেখা করতে যান, আজাদ তার মাকে বলে, 'ওরা আমাকে অনেক মারে, মা। সহ্য করতে পারি না।' আজাদের মা বলেন, 'সহ্য করবা। শক্ত থাকবা। কারও নাম-ঠিকানা বলবা না।' আজাদ সহ্য করে যায়। আজাদ কারও নাম-ঠিকানা বলে নাই। আজাদ হাল ছেড়ে দেয় নাই।

শহীদ আলতাফ মাহমুদ, বদি, জুয়েল; তাদের পেটাতে পেটাতে মেরে ফেলা হয়। তবুও তারা কারও নাম-ঠিকানা বলেন নাই। তারা

হাল ছেড়ে দেন নাই। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন।

প্লায়ার্স দিয়ে হাতের একটা একটা নখ টেনে তুললে বা নখের ভেতর সুচ ঢুকিয়ে দিলে কী পরিমাণ ব্যথা লাগে জানেন? সেটা ক্র্যাক প্লাটুনের সেই সৈনিকেরা জানেন। একমাত্র সন্তানকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে কী পরিমাণ আত্মত্যাগ দরকার জানেন? সেটা আজাদের মা জানেন।

আমাদের দেশে অনেক দুর্নীতি, অনেক ট্রাফিক জ্যাম, অনেক দূষণ, অনেক খারাপ মানুষ আর এসব নিয়ে আমাদের অনেক ক্ষোভ, অনেক অভিযোগ আছে। আমার আর আপনার এই দেশ নিয়ে যত হতাশা আছে, এই দেশের প্রতি যত ক্ষোভ আছে, আমাদের যত কষ্ট আছে, তা কোনোভাবেই আলতাফ মাহমুদের সেই রাতের কষ্টের থেকে বেশি হতে পারে না। আমাদের যতই আত্মত্যাগ থাকুক, তা আজাদের মায়ের সেই আত্মত্যাগের সমান হতে পারে না। আমার আর আপনার আলতাফ মাহমুদের প্রতি, বদির প্রতি, জুয়েলের প্রতি, আজাদের মায়ের প্রতি অনেক বড় একটা দায় আছে। একটা ঋণ আছে। আর আমার কাছে সেটাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। হাল ছেড়ে দেব না। লড়াই করব।

Let's put up a fight for this country. এই দেশে এখনো অনেক ভালো মানুষ আছে। এখনো অনেক সম্ভাবনাময় শিশু আছে। Let's not give up on them. ওদের জন্য কিছু একটা করি। ময়লাটা জায়গামতো ফেলি। দুর্নীতি দেখলে রুখে দাঁড়াই। কাউকে ভালো কিছু একটা শেখাই। পাশের মানুষটাকে সাহায্য করি।

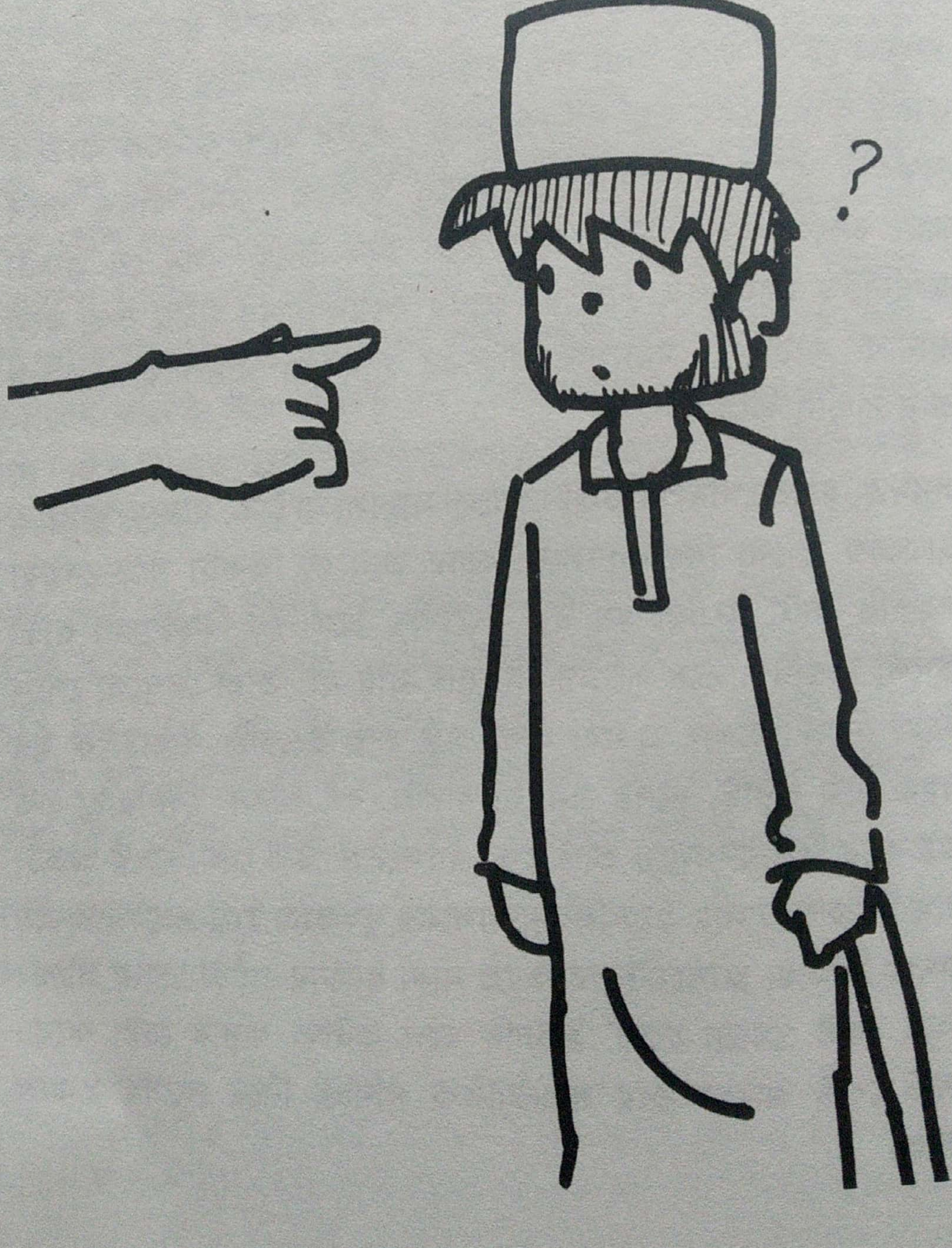
দেশটা তো আমাদের। আমরা হাল ছেড়ে দিলে এ সুন্দর দেশটাকে কে দেখে রাখবে?

মাদ্রাসার ছাত্র ভার্সিটিতে ভর্তি হইসো কেন?

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তখন দেখলাম ক্লাসের ভেতর একদল ছেলে আছে যারা লম্বা পাঞ্জাবি আর টুপি পরে ক্লাসে আসে। কারও কারও বেশ লম্বা দাড়িও আছে। এদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখতাম একটু নিজের মধ্যে কুঁকড়ে থাকতে। যেন কারও সাথে কথা বলতে চাইছে না। একটু ভয়ে ভয়ে আছে। যেন সে একটা অপরিচিত গ্রহে চলে এসেছে। ওদের কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, মাদ্রাসার বাইরের পৃথিবীটা মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য কতটা কঠিন।

প্রথমত, হাতে গোনা কয়েকটা ভালো মাদ্রাসা ব্যতীত, মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্রদের ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য যে ভিতটা গড়ে দেওয়া দরকার সেটা দেওয়া হয় না। ইংরেজি, অঙ্ক; যে বিষয়গুলো ছাড়া ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাওয়াই যায় না, তারা সেগুলো শেখে নিজে নিজে। অর্থাৎ আমরা যারা অঙ্ক আর ইংরেজি পারাটাকে খুব সহজ মনে করছি, ওদের জন্য ব্যাপারটা বেশ কঠিন। বেচারারা এত কষ্ট করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, এরপরেও কেউ যেন ওদের অতটা দাম দিতে চায় না। ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুধভাত হয়ে থাকে। কথায় কথায় শিক্ষক, ক্লাসমেটদের কাছে নানা ধরনের খোঁটা শোনা লাগে। কেউ কেউ 'মোল্লা-হুজুর' ইত্যাদি বলে কটাক্ষ করার চেষ্টা করে। কেউ কেউ আবার তার রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে।

এত কিছুর মাঝেও এসব ছাত্র দারুণভাবে পড়াশোনা এগিয়ে নিচ্ছে। অনেক মাদ্রাসার ছাত্রকে চিনি যারা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন এবং সেটা শুধু আরবি বা ফারসি ডিপার্টমেন্টে না; বরং ফিজিক্স বা ইকোনমিক্সের মতো ডিপার্টমেন্টেও। আমাদের টেন মিনিট স্কুলের টেক টিমের দারুণ একজন সদস্য আনোয়ার। ও মাদ্রাসার ছাত্র। দারুণ একজন কোডার ও সিস্টেম ডেভেলপার। তার মানে, ওরা অনেকটা পিছিয়ে থেকেও আপনার সাথে বরাবর ফাইট দিচ্ছে এবং কখনো কখনো জিতেও যাচ্ছে। তাহলে চিন্তা করুন, আমরা যে ওদের নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করি, তা কতটা অবান্তর?



বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার পাশে যদি কখনো কোনো মাদ্রাসার ছাত্র পান, তাহলে ওকে দুধভাত ভেবে বাতিল করে দেবেন না; বরং ওর কাছ থেকে ওর সংগ্রামের গল্পটা শুনতে পারেন। কে জানে, হয়তো আপনিও জীবনে লড়াই করার অনুপ্রেরণা পেয়ে যেতে পারেন।

"Most of life's actions are within our reach if you have the willpower."

– Robert McKee

মেয়েমানুষ, এত বেশি কথা বলেন কেন?

লোকাল বাস পৃথিবীর সবচেয়ে ঝগড়াময় স্থান। এখানে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে হঠাৎ ঝগড়া লেগে যায়, আর থামার নাম নেই। বাসের ভাড়া নিয়ে হেলপারের সাথে ঝগড়া, পাশের সিটের মানুষের সাথে রাজনীতি নিয়ে ঝগড়া, 'ভাই, এত ছড়ায়ে বসছেন কেন?' 'মহিলা সিটে বসছেন কেন?' এ রকম নানা বিষয়ে ঝগড়া চলতেই থাকে। মজার ব্যাপার হলো ঝগড়া যে দুজনের মধ্যেই শুরু হোক না কেন, বাসের অন্যান্য লোক দুই ভাগ হয়ে আস্তে আস্তে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। তবে এই ঝগড়ার কোনো একটা পক্ষ যদি একজন নারী হন তাহলে দৃশ্যটা একটু ভিন্ন হয়। খুব অল্প সময়েই দেখা যায় বাসের বেশির ভাগ লোক ওই নারীর বিপক্ষে চলে গেছে আর সেই নারী একাই লড়াই করে যাচ্ছে। আর তখনই শোনা যায় সেই মহার্ঘ্য বাণী, 'মেয়েমানুষ, এত বেশি কথা বলেন কেন?'

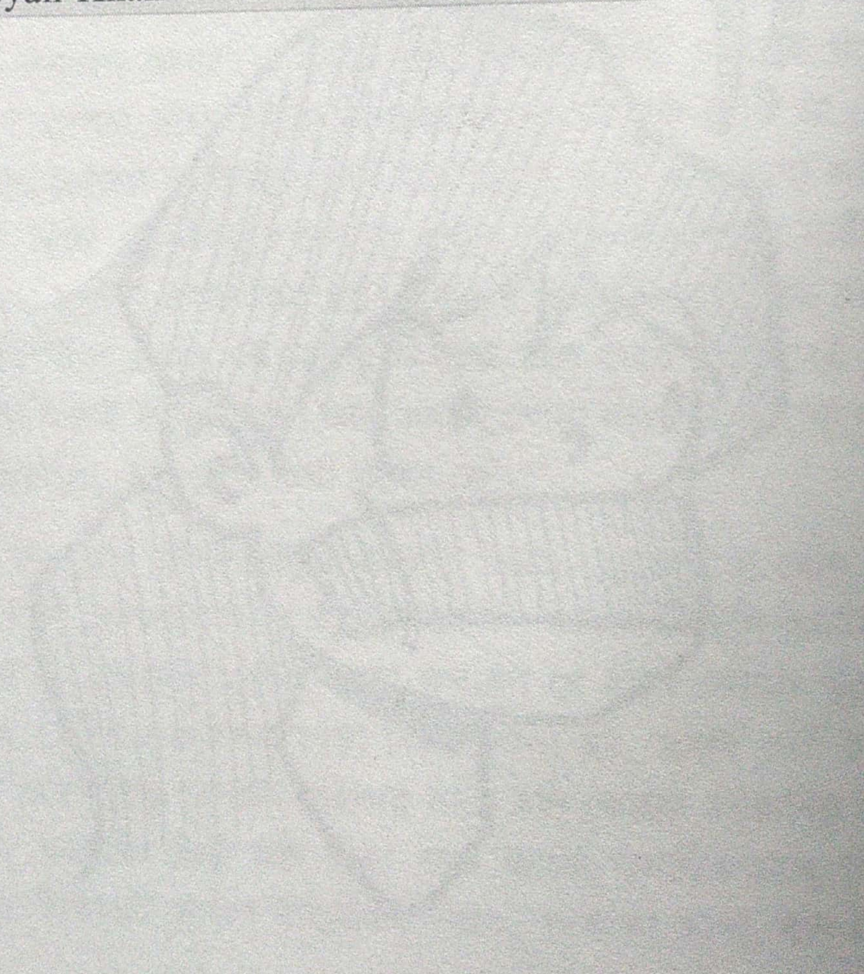
এই সমাজের একটা অদ্ভুত প্রত্যাশা আছে যে, মেয়েরা বেশি কথা বলবে না। পুরুষের সাথে তর্ক করবে না। তার সাথে যদি অন্যায় হয় তবুও সে তা মেনে নেবে। লক্ষ্য করবেন যে বাসে কোনো পুরুষের সাথে হেলপারের যখন ভাড়া নিয়ে ঝগড়া হয়, সবাই সেই যাত্রীর পক্ষ নেন। কিন্তু কোনো মহিলার সাথে যদি কোনো হয়রানির ঘটনা ঘটে, এমনকি কেউ যদি ইচ্ছা করে তাকে অযাচিতভাবে স্পর্শও করে, নিতান্তই ভালো মানুষটাও বলবে, 'থাক না আপা, বাদ দেন।'

দীর্ঘ সময় ধরে নারীদের সামাজিক শোষণের কারণে 'মেয়েরা চুপ থাকবে'-এই ধারণায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। মেয়েরাও যে দাবি আদায় করার জন্য লড়াই করতে পারে এটা আমরা একদম ভুলে গেছি। আমাদের শিল্প, সাহিত্য, নাটক, সিনেমায়ও নারীকে সব সময় সর্বংসহা চরিত্রে দেখানো হয়। অসহায়, নায়কের ওপর নির্ভরশীল আর যা কিছু হোক মুখ বুজে সহ্য করা টাইপ। ছেলের জন্য যখন বাবা-মা পাত্রী খোঁজেন তখন বিজ্ঞাপনে লিখে দেন 'চুপচাপ স্বভাবের মেয়ে চাই।' কারণ বেশি কথা বলা মেয়ে মানেই সংসারে অশান্তি। আমাদের সমাজে মেয়েদের জন্য চুপ করে থাকা, সহ্য করা যেন একটা মহত্ত্বের লক্ষণ। আর যারা প্রতিবাদ করে, নিজের দাবি আদায় করার জন্য লড়াই করে, ঝগড়া করে তারা 'খারাপ মেয়ে।'



প্রতিবাদী মেয়েরা যদি খারাপ মেয়ে হয়, তাহলে এই দেশে অনেকগুলো খারাপ মেয়ে দরকার। একজন-দুজন নয়, কোটি কোটি। যারা শত বছরের সহস্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে। বাসের সংরক্ষিত আসন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লড়াই করে ন্যায্য দাবি আদায় করতে পারবে। অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারবে। আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, সমাজের মেয়েদের চুপ করিয়ে রাখার যে বাসনা, যে প্রত্যাশা সেটাকে ভেঙে দেবে। সেই সূর্যকন্যাদের অপেক্ষায়...

> "Freedom of speech is a human right and the foundation upon which democracy is built. Any restriction of freedom of speech is a restriction upon democracy."
>
> –Deeyah Khan



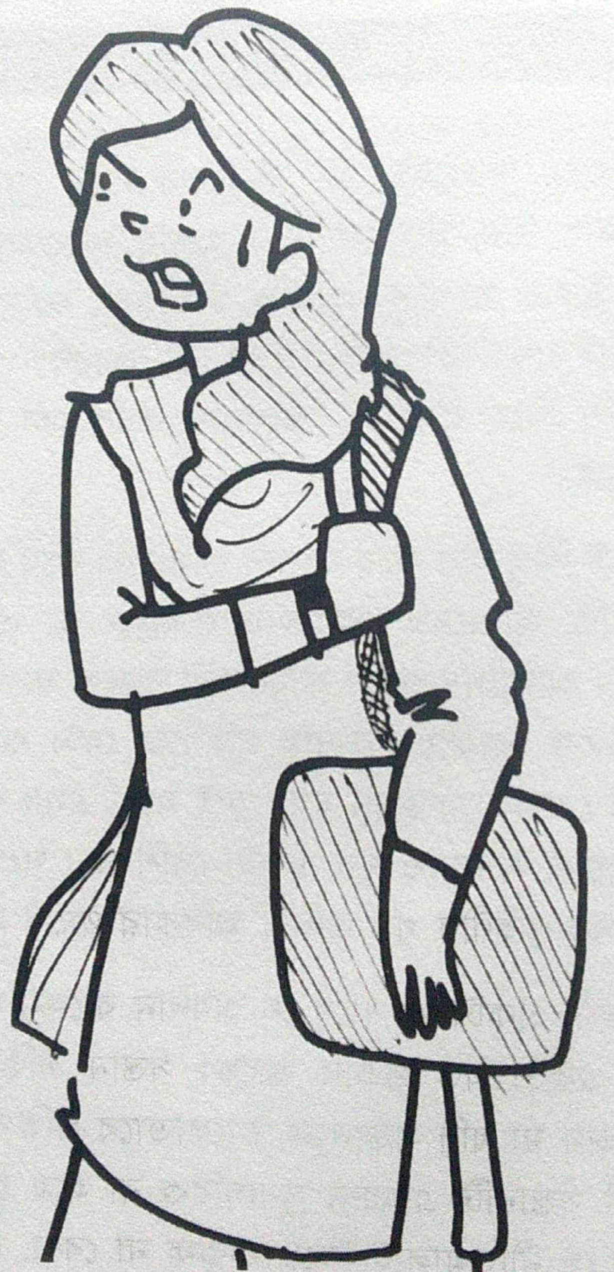
আমার বউ কিচ্ছু করে না!

চাকরির প্রথম সপ্তাহেই এক কলিগের সাথে বেশ খাতির হলো। কথায় কথায় উনি আমাকে তার বাসায় দাওয়াতও দিয়ে দিলেন। আমার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমিও সৌজন্য করে জানতে চাইলাম, 'তা ভাই, ভাবি কী করেন?' উনি বেশ সুন্দর একটা হাসি দিয়ে বললেন, 'আপনার ভাবি তো কিছু করেন না। বাসায় থাকে।'

উনি নিশ্চয়ই কিছু মিন করে কথাটা বলেননি। তবে গৃহিণীদের বাসার কাজের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ কতটুকু তা এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়। আমাদের দেশে কাজ করা বলতে সাধারণত চাকরি বা ব্যবসা করাকে বোঝায়। বাসায় গৃহিণীরা যেটা করেন, সেটা ঠিক কাজ না বা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই যারা এসব কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের সম্মানও খুব একটা বেশি না। সংসারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে এসব গৃহিণীর খুব একটা অধিকার থাকে না।

একজন গৃহিণী একটা সংসারে যে অবদান রাখেন জাতীয় জীবনেও কিন্তু তার একটা বড় প্রভাব আছে। সন্তান প্রতিপালনের কথাই ধরুন। একজন মা যদি সন্তানকে ভালোভাবে প্রতিপালন না করেন, তাহলে সেই সন্তানটি একজন সুনাগরিক না হয়ে কুনাগরিক হবে। এরপর রাষ্ট্র যে নীতিমালাই নিয়ে থাকুক না কেন, কুনাগরিক দিয়ে তো আর উন্নয়ন সম্ভব না, তাই না?

এ ছাড়া সারা দেশে যত গৃহিণী প্রতিদিন যত কাজ করছেন এর অর্থমূল্যে হিসাব করলে বিলিয়ন ডলারের কম হবে না। অথচ আমাদের যে মোট জাতীয় আয় বা মোট জাতীয় উৎপাদন হিসাব করা হয় সেখানেও এই গৃহিণীদের কাজের কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। অর্থাৎ পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত এই গৃহিণীদের অবদানকে মূল্যায়ন করে না।



এই মূল্যায়ন না করার আরেকটা খারাপ দিক আছে। আমরা মনে করতে থাকি যে আমাদের মা বা আমাদের স্ত্রী আমাদের জন্য যে

কাজটা করেন সেটা খুবই সহজ; বরং বাইরে গিয়ে দুনিয়ার রাজ্য জয় তো আমরা করছি। আমাদের কাজটাই না কঠিন। চলুন, একটা সরাসরি তুলনা করা যাক। ধরি, আপনি একটা সরকারি অফিসে চাকরি করেন। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা। ধরি, আপনি সারা দিনই কাজ করেন। তবুও কাজের মাঝে মাঝে একটু আড্ডা হয়, একটু তর্ক হয়। শুক্র, শনিবার ছুটি থাকে। মাঝে মাঝে চাইলে আরও ছুটি নেওয়া যায়। ঢাকার বাইরে ফিল্ড ট্রিপে যাওয়া যায়। বস মাঝে মাঝে গালমন্দ করেন সত্যি, কিন্তু আবার বছর বছর প্রমোশনও পাওয়া যায়। বেতন বাড়ে। সম্মান বাড়ে।

এবার একজন গৃহিণী যে কাজ করেন তার জব ডেসক্রিপশনটা দেখুন। সকাল ৯টার অনেক আগেই তার অফিস শুরু হয়ে যায় আর রাত ১০টার আগে শেষ হয় না। কাজের মাঝে আড্ডা, তর্ক করার সময় বা সঙ্গী কোনোটাই নেই। কোনো সাপ্তাহিক ছুটি নেই। এমনকি অসুস্থ থাকলেও পুরোপুরি ছুটি মেলে না। পরিবারের সাথে ছাড়া ঢাকার বাইরে কী, বাসার বাইরেই যাওয়া হয় না। এ চাকরিতে কোনো প্রমোশন নেই, কোনো বেতন বৃদ্ধি নেই। তিনি ১০ বছর আগেও গৃহিণী ছিলেন, এখনো গৃহিণীই আছেন। আর যেকোনো ত্রুটি-বিচ্যুতিতে গালমন্দ কিন্তু তাকেই শুনতে হবে। তরকারিতে লবণ কম হলে তার দোষ আবার ছেলেমেয়ে কথা না শুনলেও তার দোষ।

এত কঠিন একটা কাজ, কোনো রকম ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা না পেয়ে আপনি কত দিন করতে পারবেন? অথচ এ কাজটাই আমাদের দেশের লাখ লাখ গৃহিণী দশকের পর দশক করে আসছেন। অনেকে আবার চাকরির পাশাপাশি এই পুরো দায়িত্বটা পালন করছেন। অথচ সবচেয়ে মন খারাপ করার মতো বিষয় হচ্ছে, আমরা যারা গৃহিণী না, বিশেষ করে যারা পুরুষ তারা এই কাজে খুব একটা সাহায্য করছি না। অনেকে এসব কাজকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছি না; অনেকে 'আমি তো পারি না'-বলে এড়িয়ে যাচ্ছি। অনেকে স্রেফ পুরুষ বলে করছেন না। আমাদের দেশে পুরুষরা ঘর গৃহস্থালির

কাজ এত কম করেন, যে বাংলা ভাষায় গৃহিনীর কোনো জুতসই পুরুষবাচক শব্দও নেই।

মনে রাখবেন, রান্না করা, কাপড় ধোয়া, ঘর পরিষ্কার করা এগুলো ছেলে বা মেয়েদের কাজ না। এগুলো লাইফ স্কিল। অর্থাৎ সবাইকে পারতে হবে। 'আমি এগুলো পারি না'- বললে আপনি আরও স্মার্ট হয়ে যাবেন না, বরং পরিবারের জন্য আরও বোঝা হয়ে যাবেন। নিশ্চয়ই বাসার কেউ একজন অন্যদের তুলনায় এ কাজে বেশি নিয়োজিত থাকবেন, কিন্তু তার মানে এই না যে আমরা এ কাজে কোনো রকম সাহায্য করব না। অন্তত নিজের ঘরটা গুছিয়ে রাখা, নিজের খাবার প্লেটটা ধুয়ে রাখা আর নিজের কাপড় নিজে ধোয়া, এটুকু তো আমরা সবাই করতে পারি। তাহলেই কিন্তু আমাদের মা, আমাদের স্ত্রীদের জীবন আরেকটু সহজ হয়।

আর হ্যাঁ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যারা এ কাজগুলোর দায়িত্বে আছেন তাদের কাজকে সম্মান করতে হবে। তিনি আমাদের মা, স্ত্রী বা গৃহপরিচারিকা যে-ই হোক না কেন, তাদের সম্মান করতে হবে। তাদের কাজকেও কাজের মর্যাদা দিতে হবে।

বিয়ের পরেও চাকরি করবা?

বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোতে 'পাত্রী চাই' কিংবা 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপনগুলো বেশ মজার হয়। পাত্রীর ক্ষেত্রে 'উচ্চ বংশীয় মুসলিম পরিবারের ফর্সা, লম্বা, শিক্ষিত ও সাংসারিক মেয়ে চাই।' আবার পাত্রের ক্ষেত্রে 'লম্বা-সুদর্শন, প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই।' আচ্ছা, কখনো চিন্তা করেছেন, পাত্রের ক্ষেত্রে কেন ভালো চাকরি করা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পাত্র খোঁজা হচ্ছে, আবার পাত্রীর ক্ষেত্রে কেন শুধু সাংসারিক মেয়ে খোঁজা হচ্ছে? কারণ আমাদের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারে বিয়ের পর মেয়েদের চাকরি করার ব্যাপারে একটা ভীষণ রকমের আপত্তি আছে। এমনকি যেসব পরিবারে অর্থকষ্ট আছে, সেখানেও বাড়ির বউদের চাকরি করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, এসব পরিবার থেকে কেন বাধা দেওয়া হচ্ছে? এই কারণগুলো একটু পরীক্ষা করে দেখি?

কারণ ১: 'বাড়ির বউ বাইরে কাজ করলে বংশের সম্মান নষ্ট হয়।' বাড়ির বউ বাইরে কাজ করার সাথে সম্মানের কী সম্পর্ক তা আমার বোধগম্য নয়। বরং আপনার বাড়ির বউ যদি কোনো কোম্পানির সিইও হয়, ম্যানেজার হয় তাহলে তো বরং আপনার বাড়ির সম্মান বাড়বে। দ্বিতীয়ত, এই বইয়ের নামটা মনে আছে? লোকে কী বলবে? কিছু লোকের কটু কথার ওপর যদি আপনার বংশের সম্মান নির্ভর করে তাহলে কিন্তু কথায় কথায় আপনার সম্মানহানি হবে। মানুষ ইচ্ছা করে আপনার সম্মান ধরে টান দেবে। আপনার পরিবারে যদি

কখনো অভাব দেখা দেয় তাহলে বাইরের লোক এসে কি আপনাকে টাকা দিয়ে যাবে? আপনাকে সাহায্য করবে? মোটেই না। এখন ঠিক করুন, আপনি লোকের কথায় নিজের সম্মান পরিমাপ করবেন, নাকি নিজের সম্মান নিজে গড়বেন?



কারণ ২: 'বউ বাইরে কাজ করলে বাসার কাজ করবে কে?' প্রথমত, আপনার পুত্রবধূ কিন্তু আপনার কাজের লোক না। বাসার সবার কাজ করে দেওয়া তার দায়িত্ব না। সে যদি নিজে থেকে করতে চায় তাহলে ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু আপনি কোনো যুক্তিতেই এটা দাবি করতে পারেন না। বাসায় সবাই নিজের কাজ নিজে করার সংস্কৃতি

তৈরি করতে হবে। এরপরও যদি কোনো ভারী কাজ থাকে, বাসায় কোনো শিশু বা বৃদ্ধ থাকে তাহলে বাসায় কাজ করার জন্য কাউকে নিয়োগ করা যেতে পারে। এতে একজনের কর্মসংস্থানও হবে। এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন, কাজের লোকের বেতন কোত্থেকে দেব? বাড়ির ছেলের পাশাপাশি যদি বউও কাজ করে তাহলে কিন্তু পরিবারের উপার্জন বাড়বে। তাহলে কিন্তু চাইলেই কাজের লোক নিয়োগ করা যায়।

কারণ ৩: 'মেয়েদের বাইরে কাজ করা ইসলামবিরোধী।' এটা একদম মিথ্যা কথা। প্রথমত, সৌদি আরবে যা কিছু হয় তাকেই ইসলাম ভাবার কোনো কারণ নেই। সৌদি আরবে অনেক বাসাতেই বাড়ির কাজের লোকের সাথে রীতিমতো ক্রীতদাসের মতো আচরণ করা হয়। এটা নিশ্চয়ই ইসলামিক আচরণ না। একইভাবে নারীদের কোনো কাজ করতে দেওয়া যাবে না, এটাও বেশ মনগড়া একটা নিয়ম। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্ত্রী বিবি খাদিজা একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। বিবি আয়েশা রাষ্ট্র পরিচালনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। একজন নারী চাইলেই পূর্ণাঙ্গ পর্দার মধ্য দিয়ে চাকরি করতে পারেন, বাইরে কাজ করতে পারেন।

কারণ ৪: 'আরে আমাদের অনেক টাকা আছে, বাড়ির বউয়ের বাইরে কাজ করার কী দরকার?' চাকরি কিন্তু শুধু মানুষ টাকার জন্য করে না। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য করে। দেশের জন্য, সমাজের জন্য অবদান রাখার উদ্দেশ্যে করে। এ ছাড়া নিজে অর্থ উপার্জন করা, নিজে চাকরি করা অনেক নারীর জন্য ক্ষমতায়ন সৃষ্টি করে। সে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ করতে পারে। সব সময় তার স্বামীর কাছে টাকা চাইতে হয় না। আপনি কোন অধিকারে তাকে এই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করবেন?

কারণ ৫: 'মা চাকরি করলে বাচ্চার কী হবে?' আমি এ কারণটিকে অনেক সিরিয়াসলি দেখতে চাই। আচ্ছা, কখনো ভেবে দেখেছেন, জন্মের পর দুই বছর না হয় দুধের জন্য সন্তান তার মায়ের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু তাই বলে সন্তানের সমগ্র শৈশব-কৈশোরের

প্রাথমিক দায়িত্ব কেবলমাত্র মায়ের কেন? কখনো শুনেছেন, সন্তানের দেখাশোনা করার জন্য বাবা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন আর মা কাজ করছেন? কী, খুব বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে? অথচ এই বাড়াবাড়ি পরিমাণ স্যাক্রিফাইসটা প্রতিনিয়ত নারীদের করতে হচ্ছে। আচ্ছা, এবার সমাধানের কথা বলি। প্রথমত, দেশে আইন করে ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর থেকে কম মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়াটা অবৈধ। সুতরাং সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য নারীকে চাকরি ছাড়তে হবে না। বর্তমানে বাবাদের জন্যও ১৫ দিন পিতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মায়ের ছুটি শেষ হয়ে গেলে বাবা এই পিতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে সন্তানের দেখাশোনা করতে পারেন। স্তন্যদান ব্যতীত আর এমন কোনো কাজ নেই যেটা মা করতে পারবেন কিন্তু বাবা করতে পারবেন না। ডায়াপার বদলানো, গোসল করানো, লোশন লাগানো ইত্যাদি কাজ করার জন্য আপনাকে নারী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এখন প্রশ্ন, কিন্তু দুধ খাওয়ানোর জন্য তো মাকে দরকার। এর কয়েকটা সমাধান আছে। প্রথমত, মায়ের দুধ সঞ্চয় করে রাখা যায়। পাম্পের সাহায্যে সঞ্চিত দুধ পাঁচ দিন পর্যন্ত ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যায়। দ্বিতীয় সমাধান, কর্মস্থলে ডে কেয়ারের ব্যবস্থা। বহির্বিশ্বে অসংখ্য কর্মস্থলে ডে কেয়ার এবং ব্রেস্ট ফিডিং কর্নারের ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশে ব্র্যাকসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠানে এই সুবিধা আছে যাতে সব মা তাদের সন্তানকে চাকরিতে সাথে করে নিয়ে আসতে পারেন। একজন মায়ের চাকরি করার জন্য আত্মীয়স্বজনের সহায়তাও অনেক প্রয়োজন। বাচ্চার দাদা-দাদি, নানা-নানি বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজন দিনের বেলা বাচ্চার যত্ন নিতে পারেন। কিন্তু সব থেকে বড় সহায়তা দরকার সন্তানের বাবার থেকে। শুধু পুরুষ বলে আপনি সন্তানের যত্ন নেবেন না, এটা হতে পারে না। মনে রাখবেন, এটা কিন্তু আপনারও সন্তান। আপনার স্ত্রী ৯ মাস ওই সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন। আপনার তো আরও উচিত পরবর্তী ৯ বছর সন্তানের দেখাশোনা করা। না, একা একা করার দরকার নেই। আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সাথে দিনে ও রাতে

সময় ভাগ করে নেন তাহলে কিন্তু দুজন মিলেই সন্তানের যত্ন নিতে পারবেন আবার ক্যারিয়ারও সামলাতে পারবেন।

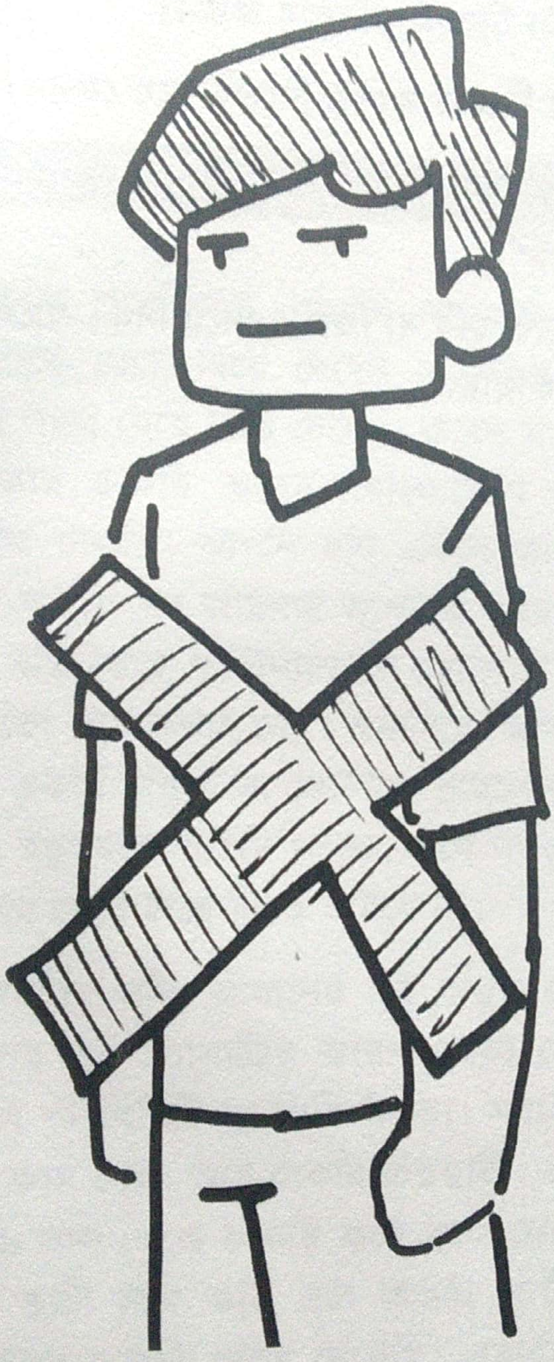
তাহলে আর কী? কী অজুহাতে বাড়ির বউদের বেঁধে রাখবেন? দেখুন, দেশের নারীরা পোশাক কারখানায়, দেশের বাইরে কাজ করছেন বলেই কিন্তু আমাদের এই জিডিপিতে উন্নতি, রপ্তানি বৃদ্ধি। এখন যদি এই অবদান অস্বীকার করেন আর মেয়েদের জোর করে বেঁধে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনি দেশের উন্নতির বিরুদ্ধে। একটা মেয়ে অনেক কষ্ট করে, বাবা-মা ও সরকারের অনেক টাকা খরচ করে পড়াশোনা করে। শুধু বিয়ের কারণে ওর স্বপ্নযাত্রা থামিয়ে দেবেন না।

এটা তো ছেলেদের কাজ না!

একটা জিনিস খেয়াল করেছেন? বাংলাদেশে উত্তরোত্তর নারীদের উন্নয়ন হচ্ছে। কিন্তু সেভাবে পুরুষদের উন্নয়ন হচ্ছে না। আগে বাংলাদেশের নারীরা শুধু ঘরের কাজ করত। এখন নারীরা চাকরি করে, ব্যবসা করে আরও কত কাজ করে। অথচ বাংলাদেশের পুরুষরা আগে চাকরি করত, ব্যবসা করত, বাইরে কাজ করত। এখনো পুরুষরা কেবল বাইরের কাজই করে যাচ্ছে। এত দিনেও দেশের বেশির ভাগ পুরুষ সাধারণ বাসার কাজগুলো পারে না। এভাবেই দিনে দিনে পিছিয়ে পড়ছে পুরুষ। হয়ে পড়ছে পরনির্ভরশীল। নারীরা যদি দুদিনের জন্য বাসায় না থাকে তাহলে হয় না খেয়ে থাকতে হবে আর অন্যদিকে বাসায় মাকড়সার জাল গড়ে উঠবে। রান্না করা, ঘর পরিষ্কার করা, ঘর গোছানো, কাপড় ভাঁজ করার মতো খুবই সাধারণ কাজ পুরুষরা শিখছে না।

কেন শিখছে না? কারণ ছোটবেলা থেকে আকারে-ইঙ্গিতে বোঝানো হচ্ছে যে এগুলো ছেলেদের কাজ না। এগুলো মেয়েদের কাজ। এই ভুল কথাটা শিখিয়ে এই ছেলেদের গুরুত্বপূর্ণ লাইফ স্কিলগুলো শেখানো হচ্ছে না। সত্যি সত্যি এই ছেলেগুলোর বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এতে আরেকটা বড় ক্ষতি হচ্ছে, এসব ছেলের এই কাজগুলোর প্রতি কোনো সম্মান জন্মাচ্ছে না। অনেক ছেলেই হয় এই কাজগুলো গুরুত্ব দেয় না, মনে করে এগুলো তো খুবই সহজ কাজ, অথবা মনে করছে এগুলো তাদের যোগ্য কাজ না। ভাবটা এমন যেন, আমি শিক্ষিত মানুষ, আমি এগুলো করব কেন?

চাকরি, ব্যবসা এগুলো যেমন ছেলেমেয়ে যে কেউ করতে পারে, বাসার কাজগুলোরও আসলে কোনো লিঙ্গ নেই। যে কেউই করতে পারে। বরং এগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ লাইফ স্কিল যে এগুলো না শিখলে আপনি নিজেই পিছিয়ে পড়বেন।



চলুন না একটু চ্যালেঞ্জ নিয়ে কয়েকটা কাজ করে দেখিয়ে দিই যে আসলেই কাজের মধ্যে নারী-পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই।

কয়েকটা চ্যালেঞ্জ আমরাই দিচ্ছি—

১. মাকে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সাহায্য করুন।

২. নিজের ঘরটা নিজেই গুছিয়ে ফেলুন।

৩. নিজের বাথরুমটা নিজেই পরিষ্কার করুন।

৪. সপ্তাহে এক দিন নিজের কাপড় নিজেই ধুয়ে ফেলুন।

৫. একদিন ছোটখাটো কিছু রান্না করে, রান্নার এই কাজটাও আস্তে আস্তে রপ্ত করে ফেলুন।

এগুলো করে ফেসবুকে ছবি বা ভিডিও দিয়ে দিন। ভালো কাজ শো অফ করতে দোষ কোথায়?

ব্যবসা করবা? কেন, চাকরি পাও নাই?

একটা কৌতুকে শুনেছিলাম, বাঙালি শ্বশুরেরা একই কোম্পানির মালিকের সাথে মেয়ে বিয়ে দেবেন না, কিন্তু সেই কোম্পানির ম্যানেজারের সাথে মেয়ে বিয়ে দেবেন। কারণ মালিক ব্যবসা করেন আর ম্যানেজার চাকরি করেন। বাংলাদেশে ক্যারিয়ার শব্দটার সমার্থক হচ্ছে চাকরি। আপনি যদি একটা ভালো চাকরি করেন তাহলে ঘরে-বাইরে সব জায়গায় আপনার জয়জয়কার। আর সেটা যদি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি বা বিসিএস চাকরি হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। অন্যদিকে আপনি পড়াশোনা শেষ করে ভালো একটা চাকরি না জোটাতে পারলে বাবা-মার কটু কথা শুনতে হবে, বন্ধুমহলে সম্মান পাওয়া যাবে না এমনকি হবু শ্বশুরও আপনার সাথে মেয়ে বিয়ে দিতে চাইবে না।

চাকরি জিনিসটার প্রতি আমাদের এই অদ্ভুত মোহ আর ব্যবসার প্রতি আমাদের এই অ্যালার্জির কারণ বোঝা বেশ কঠিন। একটা কারণ হয়তো স্ট্যাবিলিটি বা স্থিতিশীলতা। সবাই মনে করে ব্যবসা আজ আছে, কাল নেই। আর চাকরি চিরস্থায়ী। এই বইয়ের একজন লেখক ২০১৬ সাল থেকে চাকরি করে বুঝে ফেলেছে যে চাকরিকে আমরা যত স্থায়ী মনে করি এটা ততটা স্থায়ী না। আশপাশের অসংখ্য মানুষের চাকরি যেতে দেখেছি। এমনকি সরকারি চাকরি করেন এমন মানুষকে কেবলমাত্র একটা ফেসবুক পোস্টের কারণে চাকরি চলে যেতে দেখেছি। সুতরাং যে নিরাপত্তার আশায় আমরা

চাকরির পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরছি, সেটা কেবল একটা মরীচিকাও হতে পারে।

আবার এই চাকরির খোঁজে মানুষ বছরের পর বছর কী অমানবিক কষ্ট করে যায়। সারা দিন লাইব্রেরিতে বসে গাদাগাদা বই, সাম্প্রতিক তথ্যাবলি পড়া, শখানেক কোম্পানিতে সিভি পাঠানো, ইন্টারভিউয়ের পর ইন্টারভিউ, হতাশার পর হতাশা। অথচ অনেকেই এটা করেন সমাজের চাপে পড়ে। নিজে ছোটখাটো একটা ব্যবসা শুরু করতে যেন আমাদের রাজ্যের লজ্জা। চিন্তা করুন। আপনি যদি একটা ছোট ওষুধের দোকান দিয়ে মাসে ৩০-৪০ হাজার টাকা আয় করতে পারেন, আমাদের সমাজের চোখে এটার কোনো সম্মান নেই, অথচ সপ্তাহে ৬ দিন ১০-১২ ঘণ্টা অফিস করে, বসের গালমন্দ শুনে যদি ২০ হাজার টাকাও আয় করতে পারেন, এর অনেক সম্মান আছে।

আমাদের চাকরির প্রতি এই অন্ধ মোহ এবং ব্যবসার প্রতি অনীহার কারণে কী হয়েছে জানেন? দেশে চাকরি ফুরিয়ে এসেছে। সবাই চাকরি করলে নতুন চাকরি সৃষ্টি হবে কীভাবে? চাকরি সৃষ্টি হয় ব্যবসার মাধ্যমে। আপনি ছোট একটা ফার্মেসির ব্যবসা খুললে আপনার সাথে আরও একজন মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে। অথচ সবাই অন্ধের মতো চাকরির পেছনে ছুটে চাকরির বাজারে চাপ সৃষ্টি করছি। চাকরির বাজারও কিন্তু চাহিদা আর যোগানের নিয়ম মেনে চলে। অনেক বেশি চাকরিপ্রার্থী আর অল্প কিছু চাকরিদাতা থাকলে কিন্তু বেতন কমতে শুরু করে এবং এটা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে হচ্ছে। চাকরির সার্কুলার দিলে দেখবেন পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাসহ আবেদন চাওয়া হয়েছে কিন্তু বেতন মাত্র ৩০ হাজার টাকা। কারণ চাকরিদাতাও বুঝে গেছে, এই চাকরি করা ছাড়া আপনার আর কোনো উপায় নেই।

আপনি অবশ্য জিজ্ঞেস করতে পারেন, এত পড়াশোনা করলাম দোকান করে খাওয়ার জন্য? প্রথমত, দোকান করতে লজ্জা কোথায়? আপনি সৎভাবে উপার্জন করছেন, ক্রমাগত উন্নতি করছেন। হয়তো আপনি একটা ওষুধের দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন, একসময়

আপনি ওষুধের সাপ্লাইয়ার হয়ে গেলেন, একসময় হয়তো নিজের একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি স্থাপন করতে সক্ষম হলেন। তখন কি আপনার এই লজ্জার কথা মনে থাকবে? অথচ, আজ আপনি যত বড় বড় প্রতিষ্ঠান দেখেন তার সবই হয়তো একসময় ছোট একটা দোকান থেকেই শুরু হয়েছিল। তারা যদি ওই দোকান করতে লজ্জা পেত তাহলে কিন্তু এর কিছুই হতো না। দ্বিতীয়ত, আপনি যদি দোকান করতে না চান, অন্য কিছু করুন। বর্তমানে ব্যবসার পৃথিবীটা অনেক বদলে গেছে। নানা ধরনের অনলাইন ব্যবসা চলে এসেছে। অনেক তরুণই এখন এসব ব্যবসায় বিনিয়োগ করছে, শ্রম দিচ্ছে। এভাবে তারা শুধু নিজের না, বরং সারা দেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ গড়ছেন।



‘কিন্তু ভাই, ব্যবসা করতে তো টাকা লাগে অনেক। এত টাকা কই পাব?’ ব্যবসা করতে যত টাকা লাগে বলে আমরা মনে করি আসলে অত টাকা লাগে না। আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা একবারে অনেক বড় ব্যবসা করতে চাই। একদম ছোট করেও যে শুরু করা যায় তা আমরা বুঝি না। দ্বিতীয়ত, আপনি ব্যবসা করবেন বলে যদি মন স্থির করেন তাহলে ছাত্রজীবন থেকেই টাকা জমানো শুরু করুন। এই বইয়ের লেখক কিন্তু টিউশনির টাকা জমিয়ে টেন মিনিট স্কুল শুরু করেছিল। আজকে সেই প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। এ ছাড়া আপনার যদি একটা ভালো বিজনেস মডেল থাকে আপনি সহজ শর্তে ব্যাংক লোনও পেতে পারেন। আপনার ব্যবসা আইসিটিকেন্দ্রিক হলে সরকারের থেকেও সহায়তা পেতে পারেন। একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই একটা না একটা সুযোগ পেয়েই যাবেন। চাইলে কয়েক বন্ধু মিলেও ব্যবসা শুরু করতে পারেন, এতে অর্থের চাপটা সবার ওপর একটু কম পড়বে।

আইডিয়া বাক্স: কয়েকটা কাজ করে ফেলতে পারেন যেগুলো আমাদের টেন মিনিট স্কুল দাঁড় করাতে সাহায্য করেছিল।

১. কীভাবে নিজের আইডিয়াটা উপস্থাপন করবেন সেটা বোঝার জন্য স্টার্টআপ প্রেজেন্টেশন লিখে ইউটিউবে সার্চ দিয়ে সে সংক্রান্ত ভিডিওগুলো দেখে ফেলুন।

২. আইডিয়ার প্রেজেন্টেশনে কী কী থাকবে সেটা জানতে slideshare.net-এ গিয়ে স্টার্টআপ পিচ ডেকগুলো দেখে ফেলুন।

৩. আপনার আইডিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেশি বা বিদেশি কোম্পানিগুলো নিয়ে রিসার্চ করুন।

৪. কোম্পানি খোলার ট্রেড লাইসেন্স, TIN, ভ্যাট সার্টিফিকেট সম্পর্কে ধারণা নিয়ে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র করে ফেলুন।

৫. টিম মেম্বার কিংবা কাস্টমার পেতে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে পরিচিতদের জানিয়ে দিন।

৬. প্রথম ৫ ধাপ অতিক্রম করে ফেলতে পারলে আপনাকে আর কিছুই বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বাকিটা আপনি নিজেই করে ফেলতে পারবেন। আর প্রচুর অনলাইন কোর্স তো আছেই এই যাত্রায় আপনাকে সাহায্য করার জন্য। আর হ্যাঁ, কয়েকজন ভালো মেন্টর খুঁজে নিতে ভুলবেন না কিন্তু!

৭. আর কেউ যদি বলে, 'কোনো ভদ্র লোক ব্যবসা করে নাকি?' তাকে মনে করিয়ে দিবেন যে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-ও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। লোকটার হতচকিত মুখ দেখে দারুণ আনন্দ পাবেন।

এখনো বিয়ে করছ না কেন?

এখনো বিয়ে করছ না কেন? পরে তো ভালো ছেলে/মেয়ে পাবা না!

একদল মানুষ আছে যারা আপনার বিয়ে নিয়ে আপনার বাবা-মার থেকেও বেশি চিন্তিত। এদের পাওয়া যায় বিভিন্ন বিয়ের অনুষ্ঠানে। তাদের কাজই হচ্ছে বিভিন্ন বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়া এবং সেখানে অবিবাহিত মেয়েদের ধরে ধরে মনে করিয়ে দেওয়া যে তার বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে। এক্ষুনি বিয়ে করা দরকার। এরা দূর থেকে আপনাকে টার্গেট করবে; আপনি যতই পালিয়ে যেতে চান আপনার পিছে পিছে আসবে এবং আপনাকে ধরে বলবে 'কী? তোমার বিয়ে কবে খাব? তোমার তো বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে।' এতটুকু হলেও সমস্যা ছিল না। এরপর সে যাবে আপনার বাবা-মার কাছে। সেখানে গিয়ে বলবে, 'ভাবি, আপনার মেয়েকে এখনো বিয়ে দিচ্ছেন না কেন? এরপর তো আর ছেলে পাবেন না।' কেন আন্টি? দেশের সব ছেলে কি ডাইনোসরের মতো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে? নাকি ওই মেয়েটা এক বোতল কফ সিরাপ, যার এক্সপায়ারি ডেট পার হয়ে যাচ্ছে? মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই মানুষগুলো ছেলের বাবা-মাকেও ঠিক একই কথা বলেন। কোনো ছেলে প্রতিষ্ঠিত হলে বা ভালো চাকরি পেলে তাদের মাথায় প্রথম যে চিন্তা আসে তা হলো একে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। আবার ধরুন, কোনো ছেলে বেশ দায়িত্বহীন। দুপুর ১২টায় ঘুম থেকে ওঠে, সারা দিন ঘুরে বেড়ায়, কোনো কাজ করে না, রীতিমতো ভবঘুরে। আপনি ওই আন্টিকে

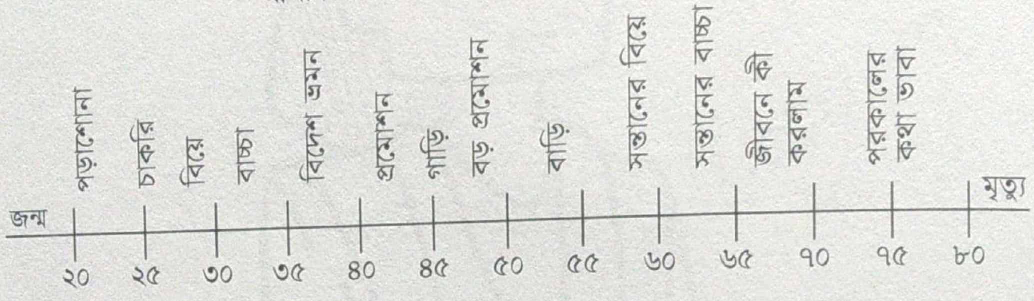
জিজ্ঞেস করবেন, সমাধান কী? সে বলবে, 'ভাবি, বিয়ে দিয়ে দেন। একদম দায়িত্বশীল হয়ে যাবে।' অর্থাৎ তারা ছেলেদের বলে 'পরে তো মেয়ে পাবা না', আবার মেয়েদের বলে 'পরে তো ছেলে পাবা না।' মাঝখান দিয়ে উভয়পক্ষই দুশ্চিন্তায় অস্থির।



এই লোকগুলোর ফাঁদে অনেক মা-বাবাই পা দেন এবং তাদের ছেলেমেয়েকে তাড়াহুড়া করে বিয়ে দিয়ে দেন। অনেক সময় যার সাথে বিয়ে দিচ্ছেন, তার সম্পর্কে ভালোমতো না জেনেই হয়ে যায় বিয়ে। অনেক সময় দেখা যায় ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কোনো মিলই নেই; অথচ 'বয়স পার হয়ে যাচ্ছে' বলে তাড়াহুড়া করে বিয়ে করে ফেলে। ফলাফল, অশান্তি, ব্যর্থ বৈবাহিক সম্পর্ক। আবার অনেকেই জীবনের এমন একটা সময়ে বিয়ে করে ফেলেন, যে সময়ে তারা বিয়ের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত না। কেউ একটা ব্যবসা দাঁড় করাতে চায়, কেউ আরও পড়াশোনা করতে চায়, কেউ বিদেশ যেতে

চায়। এসব কিছুর মধ্যে তার ঘাড়ে এসে জোটে বিয়ের প্রস্তুতি। তাদের জন্যও বিয়েটা খুব একটা সুখের অনুভূতি নয়। এমন অনেক মানুষকেই চিনি যারা বিয়ের বহু বছর পরেও আফসোস করে বলেন, 'আমি এত দিনে পিএইচডি শেষ করে ফেলতাম, কিন্তু বাবা জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলেন।' এখন বলুন, ৩০ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে করা বেশি জরুরি? নাকি সঠিক সময়ে সঠিক মানুষকে বিয়ে করা বেশি জরুরি?

আপনি এখন জীবনের কোন লেভেলে আছেন?



আপনার জীবনটা কিন্তু একটা সংখ্যারেখা বা একটা সংখ্যার ধারা না যেখানে একটার পর একটা সংখ্যা ঠিক জায়গামতো বসিয়ে যেতে হবে। আপনার জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তের সময় সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ী নয়, বরং নিজের প্রস্তুতি অনুযায়ী নিন। লোকে কী বলল, তাতে কী আসে-যায়?

আইডিয়া বাক্স: নিজের বিয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার আগে এই চেকলিস্টটা একবার দেখে নেবেন দয়া করে–

১. বিয়ের পরে থাকা-খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা আছে কি না।

২. বিয়ের পর সাংসারিক কাজে সময় দেওয়ার অবস্থা আছে কি না।

৩. নিজের বিয়ের খরচ জোগাড়ে বাবা-মাকে সাহায্য করার সামর্থ্য হয়েছে কি না।

৪. নিজে মানসিকভাবে নতুন দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত কি না।

৫. আপনি আসলেই স্বেচ্ছায় বিয়ে করছেন নাকি সমাজের চাপে সেটা একবার হলেও ভেবে দেখবেন।

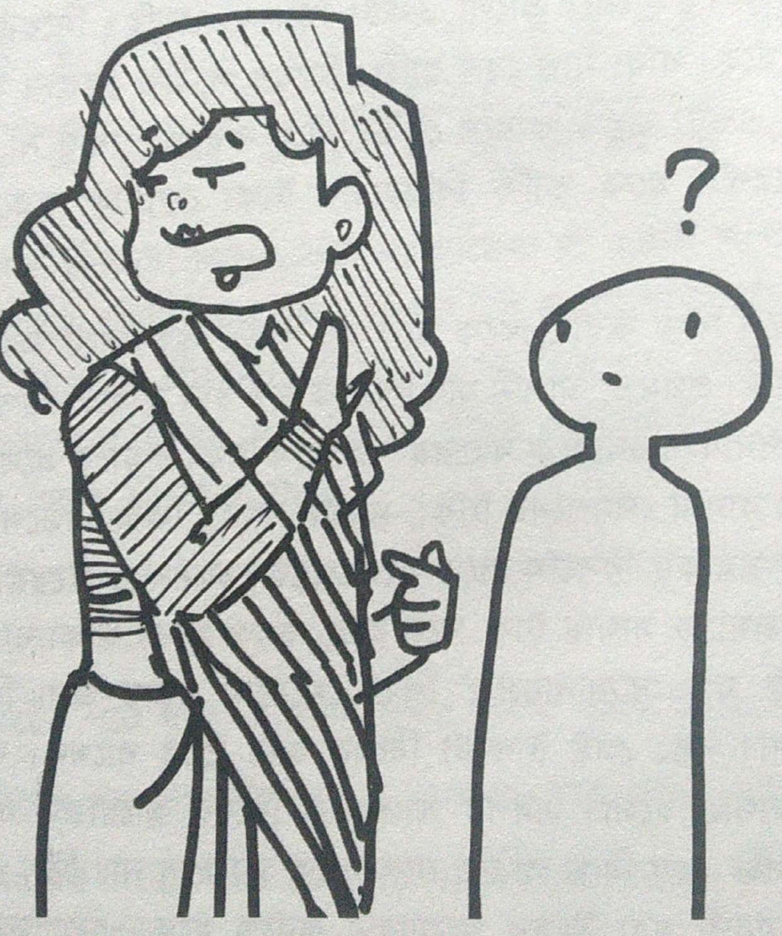
মেয়ের বাবা-মা ফকির নাকি?

মাত্র ৫ ভরি স্বর্ণ দিয়েছে? মেয়ের বাবা-মা ফকির নাকি?

আমরা (লেখক দুজন) ভালো একটা বিপদে পড়েছি। বিয়ের বয়স হয়ে গিয়েছে। বাবা-মাও বেশ রাজি। বিয়ের পাত্রীও কোনো সমস্যা না। তবু একটা অদ্ভুত কারণে কেউই বিয়ে করতে পারছি না। আর সেই কারণটা হচ্ছে কাচ্চি বিরিয়ানির টাকা জোগাড় করতে না পারা।

বাংলাদেশে বিয়ে করার থেকে মনে হয় মাউন্ট এভারেস্ট জয় করা বেশি সহজ। প্রথমত, আপনি যদি বিয়ে করতে চান তাহলে আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে বছরের পর বছর টাকা জমাতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় বাবার পেনশনের টাকা, মায়ের গয়না, ফিক্সড ডিপোজিট, জমিজমা সবকিছু বিসর্জন দিতে হতে পারে। অনেক ভাইয়ের টাকা জমাতে জমাতে মাথায় টাক পড়ে যায়, তবুও যথেষ্ট টাকা জমানো হয়ে ওঠে না। 'কন্যাদায়গ্রস্ত' পিতা মেয়েকে পড়ার জন্য বিদেশ পাঠান না। বরং সেই টাকাটা বিয়ের জন্য তুলে রাখেন। ধরুন, টাকা জোগাড় হলো। এরপর আপনাকে বিয়ের আয়োজন করতে হবে। কাজি এসে বিয়ে পড়িয়ে চলে যাবে, তা হবে না। তিন থেকে চার দিনব্যাপী মহা উৎসব আয়োজন করতে হবে। এনগেজমেন্ট, পান-চিনি, হলুদ, আক্‌দ, বিয়ে, বউভাত এসব তো আগেই ছিল। এরপর ইন্টারনেটের কল্যাণে আমদানি হয়েছে নতুন যন্ত্রণা ব্রাইডাল শাওয়ার, মেহেদি, সাংগীত, ব্যাচেলর পার্টি ইত্যাদি। এই প্রতিটি

আয়োজন হতে হবে মহা ধুমধাম করে। বিশাল বড় হল ভাড়া করতে হবে। ১২ পদের খাওয়াদাওয়া থাকতে হবে। ডিজে থাকতে হবে। আপনার বিয়ের নাচ-গানের ভিডিও যদি ফেসবুকে ভাইরাল না হয় তাহলে তো আপনার পুরো বিয়েই বৃথা। ও হ্যাঁ, লাখ টাকা দিয়ে ফটোগ্রাফার ভাড়া করতে হবে। সে বিয়ের দিন আপনার দাঁত মাজা থেকে শুরু করে রাতে বউয়ের সাথে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত সবকিছুর ছবি তুলবে। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে স্মাইল করতে করতে আপনার গাল ব্যথা হয়ে যাবে কিন্তু ছবি তোলা থামবে না। যদি আপনার তেল বেশি হয় তাহলে প্রি ওয়েডিং-পোস্ট ওয়েডিং ছবিও তুলতে পারেন। তবে অবশ্যই তার জন্য এক্সট্রা টাকা লাগবে।



শপিং। আপনি এমন এমন জিনিস কিনবেন যার সম্পর্কে আপনার কোনো আইডিয়াই নেই। এই জিনিস যে আপনার দরকার তা আপনি আজকের আগে জানতেনই না। হলুদে যেই নাচবাহিনী আছে তাদের

জন্য শাড়ি আর পাঞ্জাবি কিনতে হবে। আপনার মাসিক বেতনসমান টাকা দিয়ে কনের বিয়ের শাড়ি কিনতে হবে, বরের শেরওয়ানি কিনতে হবে। ২০-২৫ হাজার টাকা পারলারে বেরিয়ে যেতে পারে। এত খরচ করতে করতে আপনার হার্টে সমস্যা দেখা দিতে পারে। হার্টের ওষুধও কিনতে হতে পারে। সেই টাকাটাও বিয়ের বাজেটে রাখা ভালো।

দাওয়াত— এটা সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন অংশ। আপনার খালাতো ভাইয়ের শ্যালকের ভায়রার ছোট মেয়ের বান্ধবীকে দাওয়াত না দিলে সে মাইন্ড করবে। কী প্রেশার। এভাবে আপনার দাওয়াতির সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে। বিয়ের দিন দেখবেন আপনার আশপাশে অসংখ্য অপরিচিত লোক ঘুরছে।

তবুও আপনি এই সবকিছু মেনে নিয়ে এই সবকিছু করলেন। মহা ধুমধামে সবাইকে সাথে নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। কিন্তু বিয়েতে এসে দেখলেন, অনেকেই এই আয়োজনে খুশি না। কারও কাচ্চির আলু পছন্দ হয়নি। কারও বিয়ের গয়না পছন্দ হয়নি। কারও আবার বউই পছন্দ হয়নি। বিভিন্ন লোক বিয়ের বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্য করছে। বউ এত কালো কেন, বউ এত মেকআপ দিয়েছে কেন, বোরহানিতে ঝাল বেশি কেন, জর্দায় মিষ্টি কম কেন, যন্ত্রণার শেষ নাইরে ভাই। অথচ মাঝখান দিয়ে যে দুজন মানুষের জন্য এই আয়োজন তাদের ভালো লাগা নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। লক্ষ করবেন, যারা এ ধরনের নানা রকমের মন্তব্য করেন, তাদের আপনার সুখ-দুঃখ নিয়ে কিচ্ছু যায়-আসে না। তারা আপনার আনন্দের অংশীদার হতে বিয়েতে আসেনি। তারা এসেছে আপনার বিয়ের অনুষ্ঠানকে নম্বর দিতে। বউয়ের সাজ ১০-এ ৮। খাবার ১০-এ ৬। ডেকোরেশন ১০-এ ৫। আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনার আশপাশে এমন সব লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে যার আপনার সুখ-দুঃখ নিয়ে কিছুই যায়-আসে না। অথচ আপনি এই মানুষগুলোর জন্য আপনার জীবনের সঞ্চয় ইতিমধ্যে খরচ করে ফেলেছেন।

সমাজের চাপে এই বোকামিটা বছরের পর বছর সবাই করেই যাচ্ছে। রীতিমতো একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। অমুকের মেয়ে ৪০ হাজার টাকা দিয়ে লেহেঙ্গা কিনেছে। আমি ৪৫ হাজার টাকা দিয়ে কিনব। ওর বিয়েতে ৫০০ লোককে দাওয়াত দিয়েছে, আমি ১ হাজার লোককে দেব। ও সেনামালঞ্চে বিয়ে করেছে, আমি রাওয়া ক্লাবে করব। দিনশেষে ওই বর-বউগুলোকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখুন তো, এত আয়োজন করে তাদের কেমন লেগেছে বা এত আয়োজন তাদের বৈবাহিক জীবনে কোনো মূল্য যোগ করেছে কি না? বরং যে মুহূর্তে ওই দুজন নতুন একটা জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন, যখন তাদের আর্থিক সঙ্গতি সব থেকে বেশি দরকার, তখনই সেই বেচারা দম্পতিকে এ রকম সিল দেওয়ার কোনো মানে আছে?

ভবিষ্যতে যারা বিয়ে করবেন তাদের কিছু টিপস বা অনুরোধ করতে চাই। আশা করি আপনার কাজে লাগবে।

১. বিয়ের সামাজিক প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে আসুন। জামান সাহেব ১ কোটি টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন দেখে আপনাকেও তা করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আপনি দেউলিয়া হয়ে গেলে জামান সাহেব নিশ্চয়ই আপনাকে বাঁচাতে আসবেন না। আর যারা নিজেরা বিয়ে করবেন, ফেসবুকে অন্যদের বিয়ের ছবি দেখে প্রভাবিত হবেন না। সুখ জিনিসটা দামি লেহেঙ্গা আর ফটোগ্রাফির মধ্য দিয়ে আসে না। ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আসে।

২. বিয়ের বাজেটে 'নবদম্পতি কল্যাণ ফান্ড' বলে একটা জিনিস যোগ করুন। বিয়ের মোট বাজেটের ১০-১৫ শতাংশ টাকা খরচ না করে নবদম্পতির জন্য তুলে রাখা হবে। তারা ওই টাকা দিয়ে হয় নিজেদের সংসার সাজাবে, নাহলে বিদেশে ঘুরতে যাবে। এমন কিছু করবে যা একান্তই তাদের। সেখানে 'বোরহানিতে ঝাল বেশি হয়েছে' বলার কেউ যাতে না থাকে।

৩. দাওয়াতির লিস্ট সংক্ষেপ করুন। কাউকে দাওয়াত করার আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি কি তাকে যথেষ্ট পরিমাণে চেনেন?

বা সে কি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী? চক্ষুলজ্জায় পড়ে একদম অপরিচিত দূরসম্পর্কের আত্মীয়দের দাওয়াত দেওয়ার প্রচলনটা বাদ দেওয়া দরকার।

৪. যথাসম্ভব নিজের টাকায় বিয়ে করার চেষ্টা করুন। বাবা-মার জন্য বিয়ের দিনটা যাতে দুশ্চিন্তার দিন না হয়ে আনন্দের দিন হয়।

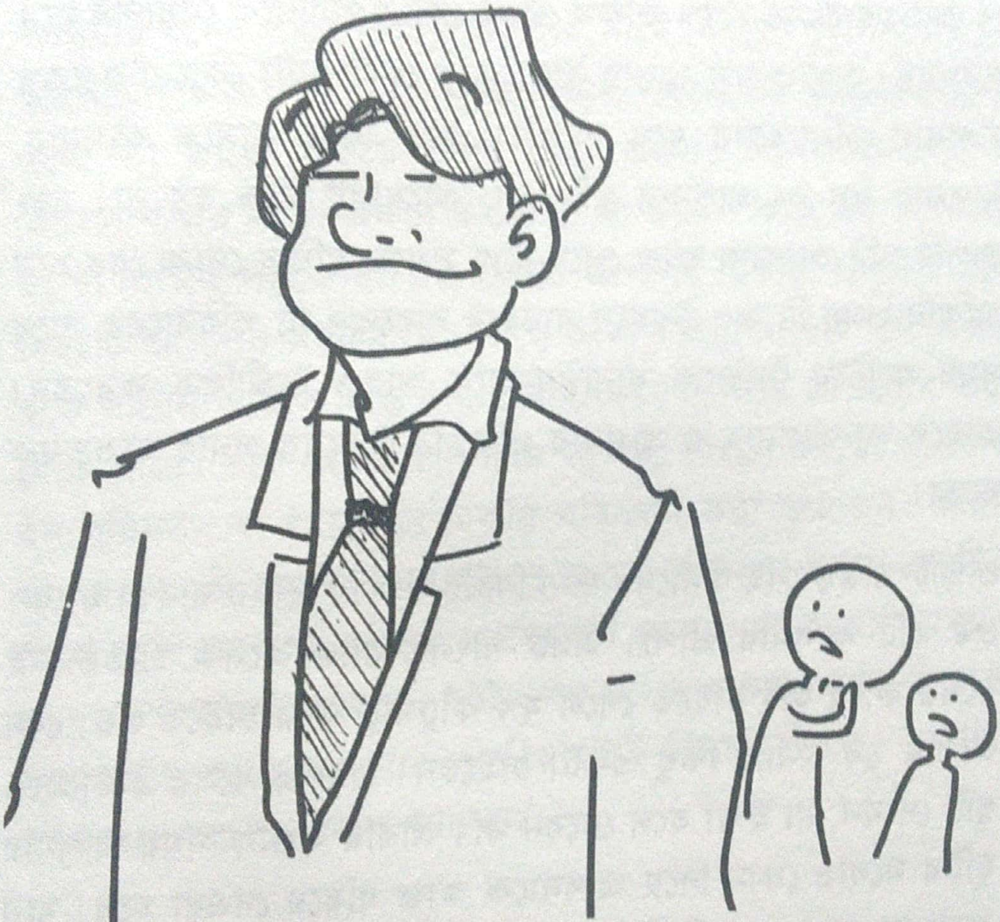
৫. ওপরের টিপসগুলো উপেক্ষা করে কেউ যদি টাকা খরচ করে অনেক ধুমধাম করে বিয়ে করে, তার বিয়ের ছবিতে গিয়ে প্লিজ কমেন্ট করবেন না, 'ভাই, এই টাকা দিয়ে তো এক লাখ গরিব মানুষকে খাওয়াইতে পারতেন।' তার টাকা আছে, সে করেছে। এখানে আমাদের নাক গলানোর কোনো দরকার নেই।

বসের সাথে দ্বিমত করলে চাকরি থাকবে? চেপে যাও!

আমরা নাটক-সিনেমায় দেখি বসের সামনে সবাইকে হুজুর হুজুর, ইয়েস বস ইয়েস বস করতে। হয়তো এ কারণে আমরা মেনে নিই যে বসের সাথে অন্যদের সম্পর্কটা এমনই হবে। ফলে যেই একটু অন্যভাবে কাজ করতে যায় সেই বেয়াদব অথবা 'বেশি বোঝে' তকমা পেয়ে যায়। ওদিকে ইয়েস বস করতে করতে মুখে ফেনা তুলে ফেলা মানুষটি প্রমোশন পেয়ে যায় আর আপনি অবাক হয়ে বেয়াদবের তকমা নিয়ে ভেবে কূল পান না যে আপনার অপরাধটা কোথায়। এটার ফলে আসলে বসের সাথে কাজ করার আগ্রহটাও চলে যায়। ক্যারিয়ারের শুরুতে ভালো চাকরি নয়; বরং খুঁজে বের করুন একজন ভালো বসকে যে আপনাকে আপনার বাকি ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত করে তুলবে। কিন্তু আদতে আমরা এর উল্টোটাই বেশি করি।

আমাদের বেশির ভাগ অফিস সংস্কৃতিতে বস ও জুনিয়রের সম্পর্কটা অনেকটা প্রভু-ভৃত্যের মতো। বসের সাথে দ্বিমত করা যাবে না। তার সামনে দাঁড়িয়ে সব সময় হেসে হেসে হাত কচলাতে হবে আর তার প্রশংসা করতে হবে। বস চাইলেই আপনার প্রাপ্য ছুটি বাতিল করে দিতে পারেন, আবার আপনাকে ছুটির মধ্যে ফোন দিয়ে কাজ ধরিয়ে দিতে পারেন। কাজ শেষ হয়ে গেলেও বস আপনাকে অফিসে রেখে দিতে পারবেন। এ রকম বসের হাজারটা অত্যাচারে অনেকের ক্যারিয়ারই বিষিয়ে ওঠে। আমি সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেতে

দেখেছি যখন বস তার সাথে কাজ করা অন্যদের নিজের প্রতিযোগী মনে করেন আর ইচ্ছে করেই নতুন কিছু শেখান না এই ভয়ে, যে কেউ যদি তাকে ফেলে এগিয়ে যায়। এমনকি নিজের দলের অন্য কারও আইডিয়া তার সামনেই বড় বসের সামনে নিজের বলে দাবি করে বসেন। এমন পরিস্থিতিতে আসলে নিজেকে সামলে রেখে কিছু করাটাও মুশকিল হয়ে যায়।



অনেকে এসব আচরণকে 'কর্পোরেট কালচার' হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। যেন এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক আর এটাই সবচেয়ে ভালো অফিস সংস্কৃতি। গুগল, ফেসবুকের মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠান কিন্তু এ রকম প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছাড়াই বেশ ভালো করছে। ইউরোপ-আমেরিকায় বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে বসের সাথে দ্বিমত করার সংস্কৃতি রয়েছে। দেখা যায় যে এই সংস্কৃতিটা অফিসে ভালো আইডিয়া জেনারেট করতে সাহায্য করে। চিন্তা করুন, রুমে

যদি শুধু বসের আইডিয়াতেই 'জী, স্যার! জী, স্যার!' করতে হয় তাহলে ভালো আইডিয়াগুলো আসবে কোথেকে?

এবার ধরুন কাজ শেষে অফিস থেকে বের হওয়ার ব্যাপারটা। অফিসের নির্ধারিত সময়ের পরেও অফিসে কখনো কখনো থাকতে হতেই পারে। কিন্তু তা শুধু কাজ থাকলেই। ধরুন আপনার অফিস ৫টায় ছুটি। আপনার দিনের কাজও শেষ। কিন্তু তবুও বাংলাদেশের বহু অফিসে বসের আগে অফিস থেকে বের হওয়াটাকে বেয়াদবি মনে করা হয়। অনেক বস আবার ইচ্ছা করে ছোটখাটো কোনো কাজের বাহানায় জুনিয়রদের ধরে রাখেন। এতে কিন্তু আসলে আপনার, আপনার বস বা আপনার প্রতিষ্ঠান, কারোরই লাভ হয় না। বরং আপনি যদি আপনার কাজ শেষে ঠিক সময়ে অফিস থেকে বের হয়ে বাকিটা সময় নিজের উন্নয়নে ব্যবহার করতেন বা পরিবারের সাথে সময় কাটিয়ে নিজেকে মানসিকভাবে আরও উজ্জীবিত করতেন। তাহলে তা আপনার ও আপনার প্রতিষ্ঠান উভয়ের জন্যই লাভজনক হতো।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ছুটির ব্যবস্থা থাকে। এই ছুটি আপনার প্রাপ্য। অথচ বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠানেই বসের কাছে ছুটি চাইতে গেলে মুখ কাঁচুমাচু করে চাইতে হয়। যেন আপনি খুব অন্যায় কিছু একটা চাইছেন। এরপর বসের ইচ্ছা হলে ছুটি দেবেন, না ইচ্ছা হলে দেবেন না। আবার অনেক সময় আপনার ছুটির মধ্যেও ফোন দিয়ে আপনাকে কাজ ধরিয়ে দেওয়া হবে। মনে রাখবেন, আপনার ছুটি কিন্তু একান্তই আপনার অধিকার। এটা জোর করে কেড়ে নেওয়া বা এর মধ্যে কাজ ধরিয়ে দেওয়ার অধিকার কারও নেই। তবে একটা সতর্কবাণী; ছুটির অপব্যবহার কিন্তু একদমই উচিত নয়। আবার প্রতিষ্ঠানের খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ছুটির আবেদন করাটাও দায়িত্বহীন আচরণ। ধরুন আপনার প্রতিষ্ঠানে নতুন কোনো প্রোডাক্ট লঞ্চ হচ্ছে। চেষ্টা করুন ওই সপ্তাহে ছুটি না নিতে। এতে করে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনার দায়বদ্ধতা প্রকাশ পাবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনার বস যদি আপনার সাথে এ ধরনের অন্যায় করতে থাকে তাহলে আপনার কী করা উচিত? আমার অভিজ্ঞতায়, যারা এসব ক্ষেত্রে একেবারেই দ্বিমত করেন না বা কোনো রকম দ্বন্দ্বে যান না, তাদের ওপর এ ধরনের বসেরা আরও চড়াও হয়ে বসেন। তাই এ ধরনের আচরণের ন্যূনতম হলেও প্রতিবাদ করতে হবে। তবে তা অবশ্যই পেশাদারত্বের সাথে। আপনার প্রথম দায়িত্ব হবে আপনার বসের সাথে অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে বিষয়টা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা। আপনার কাজ করার ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে তা তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করুন। অনেক ক্ষেত্রেই এ কাজটা করার মতো অবস্থা থাকে না বা করেও কাজ হয় না। বরং উল্টো বিপদে পড়তে হয়। এ ক্ষেত্রে আপনার দ্বিতীয় পদক্ষেপ হবে বিষয়টি আপনার সহকর্মীদের সাথে আলাপ করা। সবাই যদি একত্র হতে পারেন তাহলে কিন্তু হায়ার ম্যানেজমেন্ট পর্যন্ত অভিযোগ করা যেতে পারে। তবে এতেও যদি কাজ না হয়, তাহলে হয়তো আপনার বস পরিবর্তন বা প্রয়োজনে চাকরি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কারণ আবারও বলছি, ক্যারিয়ারের শুরুতে ভালো বেতন বা ভালো চাকরির থেকে বেশি দরকার একজন ভালো বস যে আপনাকে ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত করতে পারবে। যদি এমন বসের পাল্লায় পড়েন তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে আপনার ক্যারিয়ারটাই বিপদে পড়বে। সুতরাং, এসব ভয়ংকর বস থেকে সাবধান।

তুই এত ক্ষ্যাত কেন?

আমরা যারা শহরে থাকি তারা অনেকেই মনে করি যে যারা আমাদের মতো চলাফেরা করে না তারা সবাই ক্ষ্যাত। এমন একটা ভাব যে আমরা যেভাবে যে কাজটা করি, ঠিক সেভাবেই সে কাজটা করা ফরজ। এটা ভাষা থেকে শুরু করে খাওয়া পর্যন্ত সব জায়গায় দেখা যায়। আমাদের মতো বাংলার সাথে হালকা ইংলিশ মিশিয়ে কথা বলতে না পারা মফস্বল থেকে আসা সহপাঠীকে নিয়ে রঙ্গ তামাশা না করলে যেন আমাদের পেটের ভাত হজম হয় না। আমরা যেসব মাপকাঠির বিচারে একজনকে ক্ষ্যাত বলি বা ভাবি সেগুলো নিতান্তই হাস্যকর ও ঠুনকো। দামি রেস্টুরেন্টে কীভাবে অর্ডার করতে হয় আর কীভাবে কাঁটা চামচটা সঠিক হাত দিয়ে ধরে আলতো করে খেতে হয় এটা জেনেই যদি নিজেকে বাহাদুর মনে করি তাহলে সেই চিন্তাটাই আসলে ক্ষ্যাত। আরেকটা জিনিস একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন যেসব বিষয় নিয়ে মানুষ অযাচিত আড়ম্বর করে কিংবা বাহাদুরি দেখায় তার একটাও কিন্তু নিজের অর্জিত কিছু না বরং জন্মসূত্রে কপালের জোরে পাওয়া। এই যেমন আপনি অনেক ফিটফাট জামা-কাপড় পরেন আর যারা ফ্যাশনে একটু পেছনে পড়ে আছে তাদের ক্ষ্যাত বলে মনে করেন। আপনার এই পোশাক-আশাকের আড়ম্বর কিন্তু কেবলমাত্র আপনার সচ্ছল পরিবারের কারণেই সম্ভব হয়েছে। এই বোধোদয়টা একবার হলে পরবর্তী সময়ে আর যাই হোক কাউকে ক্ষ্যাত ডাকতেও খটকা লাগার কথা।



এই কথায় কথায় ক্ষ্যাত ডাকা মানুষদের চোখে হালকা 'কুল' হওয়ার জন্য আমরা কয়েকটা গুটিবাজি আইডিয়া বের করেছি। দেখুন কাজে দিতে পারে:

১. কিছু ভালো পাঞ্জাবি কিনেছি বড় অনুষ্ঠানগুলোতে পরার জন্য যাতে প্রথম ইম্প্রেশনটা ভালো হয়।

২. আগে পাঞ্জাবির সাথে স্যান্ডেল পরতাম এখন লোফার পরি।

৩. মাঝে মাঝে পরিচয় পর্বে একটু ইংরেজিতে কথা বলি।

৪. হ্যান্ড শেকের সময় শক্ত হাতে হ্যান্ড শেক করে নিজের কার্ডটা দিয়ে দিই।

ব্যস, কাজ শেষ! বাকিটা আপনি সামলে নিতে পারবেন।

এসব করে তো ভাত পাবা না!

ইউটিউবার? ইউটিউব আবার কী? এগুলা করে চাকরি পাবা? যাও পড়াশোনা করো।

ইন্টারনেটের এসব ধাপ্পাবাজিতে বিশ্বাস করবে না। আউটসোর্সিংয়ের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। জীবনে একটা স্থায়ী ক্যারিয়ার দরকার।

গেম ডেভেলপার? মানে বাচ্চাদের খেলার গেম বানাবা? আর কাজ পাও না? টাকা কামাই করবা কীভাবে?...

ডিএসএলআর কেনা একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে এখন।

একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে এমন কিছু পেশা চলে এসেছে যেগুলো সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ভালো ধারণা নেই। আর আমরা সব সময়ই অপরিচিত কিছুকে ভয় পাই। তাই সমাজে এই সব পেশা সম্পর্কে একটি খারাপ ধারণা বিদ্যমান। অনেকেই এখনো প্রচলিত পেশাগুলোর মধ্যেই স্থায়িত্ব ও নির্ভরতা খোঁজেন। এতে দোষের কিছু নেই। তবে নতুন যে কাজগুলো আসছে, তাদের ছোট করে দেখা বা সেগুলোকে অসম্মানের কাজ মনে করাটা কি বুদ্ধিমানের কাজ? আসুন, এই পেশাগুলো সম্পর্কে আমাদের সাধারণ অভিযোগগুলো একটু খতিয়ে দেখি।

অভিযোগ ১: এসব কাজ করে টাকা উপার্জন করা যায় না।

ভুল কথা। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটে এখন অর্থ উপার্জনের হাজারটা উপায় আছে। কীভাবে টাকা উপার্জন করতে হবে এ বিষয়ে নানা

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। এই বইয়ের দুজন লেখকই ইউটিউবে ভিডিও বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। দেশের লাখ লাখ তরুণ আউটসোর্সিং করে নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে নিচ্ছে, স্বনির্ভর হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, অন্য যেকোনো কাজের মতোই এ কাজেও দক্ষতা প্রয়োজন, অধ্যবসায় প্রয়োজন, পরিকল্পনা প্রয়োজন। যদি এগুলো না থাকে, তাহলে অর্থ উপার্জন করতে না পারার দোষ কিন্তু এই পেশাগুলোর নয়, বরং আপনার নিজের।



অভিযোগ ২: এসব কাজের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

এ কথাটাও ঠিক না। পৃথিবীটা দিন দিন প্রযুক্তিনির্ভর হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনোদন, কেনাকাটা সবই এখন ইন্টারনেটে হচ্ছে। অর্থাৎ যত দিন গড়াবে তত এই সব পেশার গুরুত্ব বাড়বে। যেমন ধরুন,

সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং বলতে কোনো পেশা আজ থেকে ১০ বছর আগে হয়তো ছিলই না। অথচ এটাই এখন মার্কেটিংয়ের মূল কেন্দ্রবিন্দু এবং এ কাজ করে দেশের অসংখ্য তরুণ ঘরে বসেই অনেক টাকা উপার্জন করে ফেলছে। অন্যদিকে আপনি যে পুরোনো পেশাগুলো খুব দীর্ঘস্থায়ী ভাবছেন, প্রযুক্তির চাপে সেগুলোও যে একসময় থাকবে না, তা কি ভেবেছেন কখনো। দেশের অর্থনীতি এখনো অনেকটা পোশাকশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। যেই হারে অটোমেশন বেড়েছে আর ১০ বছরের মধ্যে আমাদের পোশাকশিল্পের সব কাজ রোবটকে দিয়ে করিয়ে ফেলা যাবে। তখন বিদেশে আমাদের চাহিদা কমে যাবে। অর্থাৎ যেসব পেশাকে আমরা খুব স্থায়ী মনে করি সেগুলোও খুব একটা স্থায়ী না।

অভিযোগ ৩: এসব কাজে সম্মান নেই।

হ্যাঁ, এটা সত্যি এবং এটা আমাদের কারণেই সত্যি। আমরা সম্মান করি না বলেই সম্মান নেই। ইউটিউবার, ফ্রিল্যান্সার, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটার এরাও কিন্তু সমাজে একটা ভূমিকা পালন করছে। এই আমাদের কথাই ধরুন। আমরা ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষকে অঙ্ক-ইংরেজি পড়ানোর চেষ্টা করছি। দেশের দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ বিনা মূল্যে পড়াশোনা করছে। এ কাজ সম্মানের হবে না কেন? যদি লাখ টাকা বেতন পাওয়া ব্যাংকার সম্মানের দাবিদার হয়, ডাক্তার সম্মানের দাবিদার হয়, তাহলে আমরাও সম্মানের দাবিদার। আর সৎপথে উপার্জনের যেকোনো পথই তো সম্মানের।

আইডিয়া বাক্স: পৃথিবীর অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন কিছু চেষ্টা করে যাচাই করা অনেকটাই সহজ। আপনার পরিকল্পনা বা আইডিয়া কাজ করবে কি না সেটা খোতিয়ে দেখতে ছোট পরিসরে সেটি 'পাইলট' করে দেখুন। বন্ধুদের কাছে আপনার পণ্য বা সেবাগুলোকে তুলে ধরুন। দেখুন কেউ কিনতে চায় কিনা। মোটকথা নিজের আইডিয়াগুলোকে বাজিয়ে দেখুন। শুধু শুধু মানুষের কথা শুনে নিজের আইডিয়াগুলো ফেলে দেবেন না।

প্রতিবন্ধীদের মতো করিস কেন?

হেলেন কেলার। বিখ্যাত মার্কিন লেখিকা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তার লেখনী ও সমাজভাবনা দিয়ে কোটি মানুষকে নাড়া দিয়ে গেছেন। তিনি শৈশব থেকে দৃষ্টি ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী।

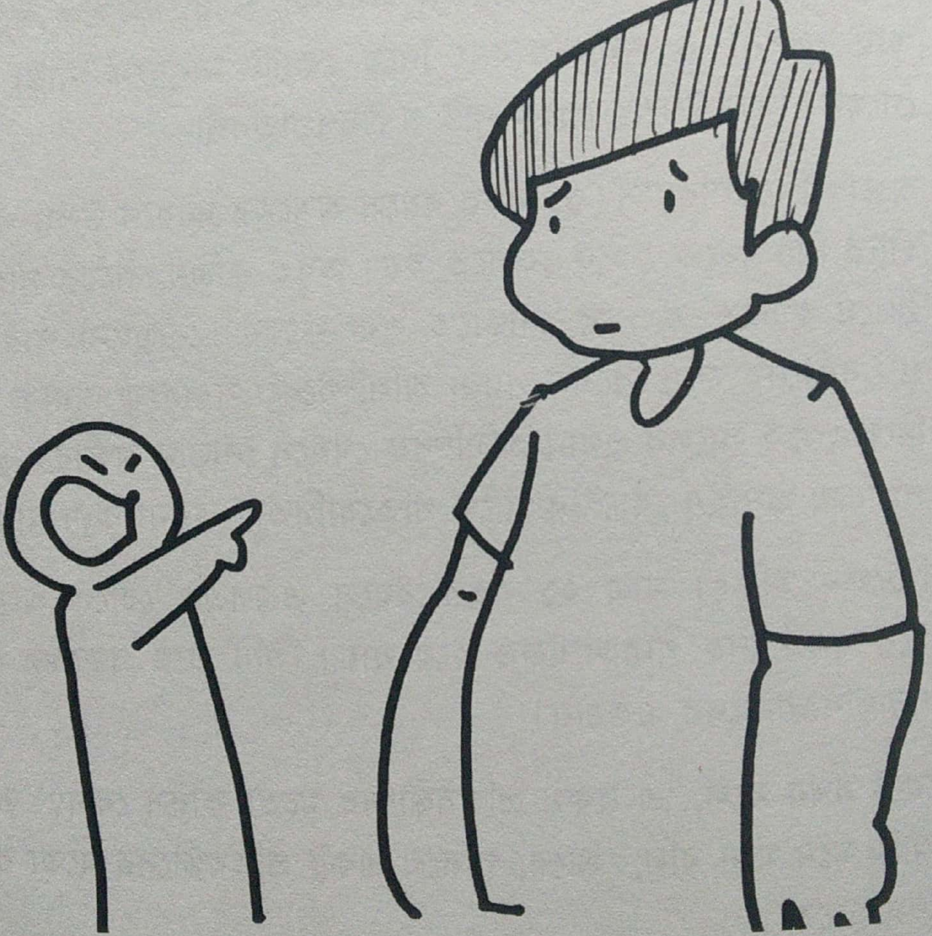
অস্কার পিস্টোরিয়াস। ১১ বছর বয়সে অসুখের কারণে উভয় পায়ের হাঁটুর নিচ থেকে কেটে ফেলতে হয়। তবুও কৃত্রিম পায়ের সাহায্যে প্রথমে হাঁটতে ও পরে দৌড়াতে শুরু করেন। দৌড়ানো শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ প্যারা অলিম্পিকে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ২০১২ সালের প্রধান অলিম্পিক গেমসে দৌড়ান অস্কার। কৃত্রিম পা নিয়ে উসাইন বোল্টের সাথে প্রতিযোগিতা। কল্পনা করা যায়?

স্টিফেন হকিং। মাত্র ২১ বছর বয়সে এএলএস রোগে আক্রান্ত হয়ে সমগ্র দেহ প্যারালাইজড হয়ে যায়। তিনি তার প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানীদের একজন।

কেউ যখন বলে, 'এ রকম প্রতিবন্ধীদের মতো করিস কেন?' তখন আমি মনে মনে বলি, 'আরে, পারলে একটু প্রতিবন্ধীদের মতো করে দেখাও তো।'

যারা শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী, তাদের দৈনন্দিন জীবনটা আমার আপনার থেকে অনেক বেশি কঠিন। যেসব কাজ আমি-আপনি খুব সহজে, অল্প সময়ের মধ্যে করে ফেলতে পারি, সেগুলোই তাদের জীবনে খুব কঠিন। তাদের জীবনের প্রতিটি ধাপে আছে

প্রতিবন্ধকতা। অথচ এই সব প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে তারা আমাদের মতো স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। তাই আমার কাছে 'প্রতিবন্ধীর মতো করা'– মানে জীবনের সব প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ানো। মাথা উঁচু করে বাঁচা। আপনি যখন কাউকে বলেন, 'প্রতিবন্ধীর মতো করিস কেন' এই প্রতিবন্ধী কথাটা একটা গালি হয়ে যায়। প্রতিবন্ধী একটা গালি হবে কেন? এটা অপমানের বিষয় হবে কেন? বরং যেই মানুষটা এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমাদের মাঝে বেঁচে আছে, সমাজে কন্ট্রিবিউট করছে, আমাদের তো উচিত তাকে মাথায় তুলে রাখা।



প্রতিটি শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা। তাদের প্রতিদিনের সংগ্রামে তাদের সহায়তা করা উচিত। অন্তত তাদের সম্মান করা উচিত। এমন একটা সমাজ গড়ে তোলা দরকার যেখানে প্রতিবন্ধী একটা অপবাদ নয়; বরং একজন সংগ্রামীর নাম।

একটি চ্যালেঞ্জ: তোমার চোখ একটি কাপড় দিয়ে বেঁধে নিজের ঘরের মধ্যে ১০ মিনিট হেঁটে বেড়াও। নিজের চিরপরিচিত রুমের মধ্যেই অনেকবার হোঁচট খাবে। অথচ এটাই একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের সারা জীবন। এই চ্যালেঞ্জের পর থেকে কিন্তু প্রতিবন্ধী শব্দটা তোমার কাছে একটা গালি হওয়া উচিত না, হওয়া উচিত একটি অনুপ্রেরণা।

সবই টাকা কমানোর ধান্ধা!

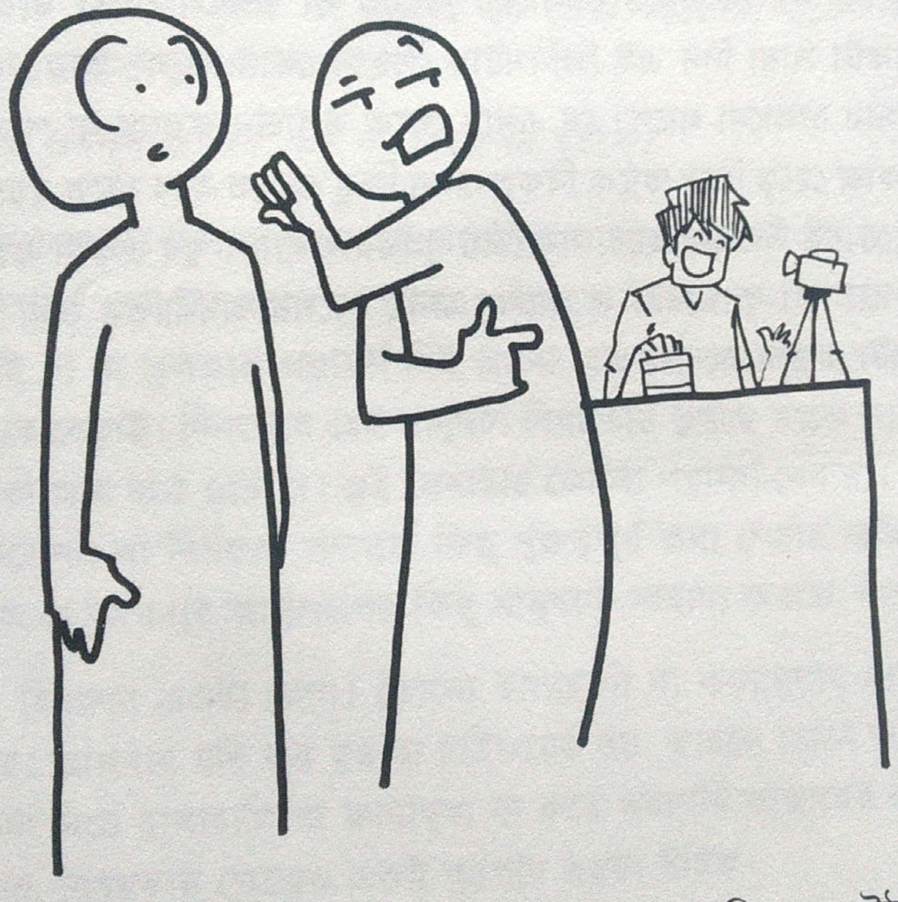
'গুগল আপনার ইনফরমেশন বেইচা কত টাকা কামায় জানেন? আপনি তো ফ্রি মনে করসেন, কিন্তু আপনারে তো বেইচা খাইতেসে।'

অনলাইনে পড়াশোনা, না ফাইজলামি। খালি টাকা কামানোর ধান্ধা। দেখেন না কার লোগো লাগায়া ঘুরতেসে বেহায়ার মতো?

আমরা ব্যবসা জিনিসটা পছন্দ করি না। দান পছন্দ করি। ফ্রি লাঞ্চ পছন্দ করি। যখনই কেউ কোনো একটা চমৎকার কাজ করার পাশাপাশি টাকা বানানোর একটা পথ বের করে ফেলে, তখনই সে খারাপ লোক। একটু ভেঙে বলি। ধরুন, আপনি জানতে পারলেন একটা লোক প্রতিদিন ১০০ মানুষকে খাওয়ায়। আপনি লোকটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন। আবার যদি জানতে পারেন যে এই কাজ করার মাধ্যমে সে দিনে ১০ হাজার টাকা আয় করে। হঠাৎ আপনার মনে হবে, 'ও, এই তাহলে ব্যাপার। ওই সব দানটান কিছু না, সবই ব্যবসা।' যদিও সে কিন্তু এখনো ১০০ লোককে খাওয়াচ্ছে।

এই চিন্তাটা কিছুটা প্রতিষ্ঠানবিরোধী চিন্তা, কিছুটা হিংসা ও বেশ বড় অংশে ছোটলোকির কারণে হয়। ভালো কিছুর জন্য টাকা খরচ করতে ভাল্লাগে না। ইশ্, ফ্রি হলে কী মজা হতো, এ রকম মনে হয়। আবার এক লোক বসে বসে টাকা কামাচ্ছে এটাও ভালো লাগে না। প্রথমত, একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন, ওই লোকটা বসে বসে কামাচ্ছে না। এই দেশের প্রত্যেক উদ্যোক্তাই তার ব্যবসাকে দাঁড় করানোর জন্য অনেক কষ্ট করেন। সারা দিন মানুষের অফিসে অফিসে ঘুরে

বেড়ান, একটু সাপোর্টের জন্য। ব্যাংকের দুয়ারে ধরনা দিয়ে বসে থাকেন। রাত জেগে ভিডিও শুট করেন বা কোডিং করেন। এই মানুষগুলো আরও অনেক চাপে থাকে। পরিবার সব সময় এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে। মাঝে মাঝে বকাঝকাও করে। পাশের বাসার আন্টির কথা শুনতে হয়, 'ভাবি, আপনার ছেলে চাকরি পায়নি?' মাঝেমধ্যেই ক্লায়েন্ট টাকা আটকে রাখে; খালি পকেটে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হয়। আর এত কষ্ট শেষে যখন তার পরিশ্রমটা একটু ফলাফল নিয়ে আসে, কোম্পানিটা একটু বড় হয়, তখন দেখে মনে হয়, 'আরে, এইটা তো খুবই সহজ কাজ। বসে বসে টাকা কামাচ্ছে।'



আমাদের দেশে খুব সুন্দর একটা স্টার্টআপ সংস্কৃতি গড়ে উঠছে। পাঠাও দেখতে দেখতে বিশাল কোম্পানি হয়ে গেল; ভেঞ্চার ক্যাপিটাল পেয়েছে। অনেকেই বাসায় বসে ভিডিও গেম বানাচ্ছে, সফটওয়্যার বানাচ্ছে। আমরা কয়েকজন একটা অনলাইন স্কুল দাঁড়

করানোর চেষ্টা করছি। অনেকেই কিছু না কিছু করার চেষ্টা করছে। আবিষ্কার হচ্ছে, মানুষজনের কর্মসংস্থান হচ্ছে। এই মানুষগুলোকে একটু সাপোর্ট দেবেন প্লিজ। আপনার কোনো বন্ধু নতুন একটা ব্যবসা দিলে তার কাছে ফ্রি জিনিস না চেয়ে তার কিছু পণ্য অর্ডার করে তাকে সাপোর্ট করতে পারেন। আমাদের দেশে দেখা যায়, কোনো একটি প্রতিষ্ঠান খুব অল্প সময়ে সুনাম অর্জন করলে একদল লোক আছে যারা পরশ্রীকাতর হয়ে ওই প্রতিষ্ঠানের নিন্দা করে বেড়ায়। এ ধরনের নিন্দা করার প্রবণতা থেকেও বেরিয়ে আসা দরকার।

আর হ্যাঁ, টাকাপয়সার ব্যাপারটা। সাসটেইন্যাবিলিটি বলে একটা ব্যাপার আছে। যেকোনো উদ্যোগ, তা যত মহৎই হোক, একটা সময়ের পর রেভিনিউ জেনারেট করতে না পারলে টেকে না। যে লোকটা সারা দিন এই জিনিসটার পেছনে লেগে থাকে, তারও তো সংসার চালানো লাগে। সে এখান থেকে উপার্জন করতে না পারলে এ কাজ ছেড়ে দিয়ে তাকে বিকল্প এমন কিছু করতে হবে যাতে হয়তো শুধু তারই উপার্জন হবে, সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে খুব একটা কাজে আসবে না। ব্যাপারটা এ দেশের জন্য, দেশের অর্থনীতির জন্য খুব একটা ভালো হবে না।

ডিপ্রেশন আবার কী? ভং ধরসো?

'এসব ডিপ্রেশন আবার কী? কাজে মন দাও সব ঠিক হয়ে যাবে'

'তোর জীবনে এমন কী হয়েছে যে তোর ডিপ্রেশন হবে? আমি লাইফে কম স্ট্রাগল করসি?'

'এই জানিস জানিস, ওর না, ডিপ্রেশন হইসে।'

ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতা। একটি মানসিক ব্যাধি। আমরা এই রোগটা সম্পর্কে এত কম জানি যে কারও এই রোগ হয়েছে শুনলে হয় পাত্তা দিই না বা ভুলভাল পরামর্শ দিই অথবা এর-ওর কাছে কুৎসা রটনা করে বেড়াই। দিনশেষে যেই মানুষটা বিষণ্ণতায় ভুগছে তাকে সাহায্য করা আর হয়ে ওঠে না। এই লেখাটায় কোনো পরামর্শ দেব না। বরং ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করি, যা হয়তো আপনার আশপাশের কিছু মানুষকে সাহায্য করতে পারে।

১. বিষণ্ণতা একটা রোগ। কোনো হাসাহাসি বা কানাঘুষার ব্যাপার নয়। আপনার যদি জ্বর হয় বা টাইফয়েড হয়, তাহলে যেমন আপনি এটা নিয়ে হাসাহাসি বা কানাঘুষা না করে সরাসরি ডাক্তারের কাছে যান, বিষণ্ণতার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার হওয়া উচিত।

২. বিষণ্ণতার সব সময় কোনো বাহ্যিক কারণ থাকে না। যদিও বেশির ভাগ সময়ই ডিপ্রেশনের পেছনে মানসিক আঘাত, ক্লান্তি, স্ট্রেস ইত্যাদি বিষয় কাজ করে, অনেক সময় হরমোনাল বা জেনেটিক্যাল কারণে বা শুধু মস্তিষ্কে রাসায়নিক গোলমালের কারণেও বিষণ্ণতা

হতে পারে। সুতরাং, 'তোর জীবনে এমন কী হয়েছে যে তুই এমন ডিপ্রেশনে পড়ে গেলি'—এটা একদম অবান্তর একটি প্রশ্ন।'



৩. ডিপ্রেশন আর মন খারাপ এক জিনিস নয়। আমরা অনেকেই বলে বসি, 'আমার পড়ালেখা এত খারাপ যাচ্ছে, আমি মনে হয় ডিপ্রেশনে পড়ে যাব।' বা 'আমার ব্রেকাপ হলে আমি ডিপ্রেসড হয়ে যাব।' অর্থাৎ আমরা অনেকেই ডিপ্রেশনকে মন খারাপের চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে ধরে নিই। আসলে ব্যাপারটা এমন নয়। এটি একটি রোগ যা একজন সুখী মানুষের মস্তিষ্কেও বাসা বাঁধতে পারে। আবার অনেক মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে যাওয়া মানুষটিও যে ডিপ্রেশনে পড়বে এমন কোনো কথা নেই। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, সাধারণ মন খারাপ আর ডিপ্রেশনের মধ্যে পার্থক্য করব কীভাবে? ডিপ্রেশনের কিছু সাধারণ লক্ষণ আছে, যেমন দীর্ঘ সময় ধরে মন খারাপ বা শূন্য অনুভূতির অবস্থায় থাকা, কারণ ছাড়াই মন খারাপ বা মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকা, সার্বক্ষণিক অসহায় ও অস্থির বোধ হওয়া, ক্ষুধা ও ঘুমের

চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন, শারীরিক ও মানসিক আলস্য বা ফ্যাটিগ; স্মরণশক্তি ও মনোনিবেশে বিশেষ সমস্যা ইত্যাদি। এসব লক্ষণ যদি পরিলক্ষিত হয় তাহলে ওই ব্যক্তির ডিপ্রেশন হয়ে থাকার আশঙ্কা আছে। তবে এ ক্ষেত্রেও মনোবিজ্ঞানী বা চিকিৎসকের মতামত ছাড়া শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করা ঠিক হবে না।

৪. ডিপ্রেশন স্থায়ী রোগ নয়। এর চিকিৎসা আছে। অনেকেরই আবার চিকিৎসা ছাড়াই নিজে থেকে সেরে যায়। অনেকের ক্ষেত্রে এটি বেশ স্বল্পস্থায়ী হয় এবং পরবর্তী সময়ে আবার ফিরে আসে।

৫. ডিপ্রেশনের কোনো বয়স নেই। যদি কোনো শিশু বা কিশোর আপনার কাছে ডিপ্রেশনের লক্ষণ বর্ণনা করে তাহলে সে অল্প বয়সী বলে তার কথা উড়িয়ে দেবেন না। শিশুদের মধ্যেও এই রোগ দেখা যায়।

৬. সবার ডিপ্রেশন মোকাবিলা করার ক্ষমতা এক নয়। অনেকেই কোনোরকম চিকিৎসা ছাড়া নিজেই ডিপ্রেশন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। আবার অনেককে থেরাপি, ওষুধ ইত্যাদির সাহায্য নিতে হয়। অনেকেই নিজের অভিজ্ঞতার কারণে অন্যের সমস্যাগুলো পাত্তা দিতে চায় না। তারা বলে, 'আরে আমার এ রকম কত হইসে, এগুলা কোনো ব্যাপারই না।' হয়তো আপনার জন্য ব্যাপার না। কিন্তু অনেকের জন্যই অনেক কঠিন ব্যাপার। জিনিসটা অনেকটা এ রকম। আপনি একটা পাঁচ বছর বয়সী শিশুকে বললেন, 'আরে তুমি এই পাঁচ কেজি ওজন ওঠাতে পারছ না? জন সিনা তো ২০ কেজি ওজনও তুলতে পারে।' সবার শারীরিক ক্ষমতা যেমন আলাদা হয়, মানসিক ক্ষমতাও আলাদা হয়। তাই ডিপ্রেশনের মতো মানসিক ব্যাধিকে প্রতিহত করার ক্ষমতাও আলাদা হয়।

৭। শুধু আনন্দ-ফুর্তি করে ডিপ্রেশনের চিকিৎসা করা যায় না। কেউ আমাদের কাছে ডিপ্রেশনের কথা বললে আমরা অনেকেই বলি, 'আরে চল সিনেমা দেখে আসি, সব ঠিক হয়ে যাবে।' এটা আসলে এই রোগের সমাধান না; বরং ডিপ্রেশনে আক্রান্ত কাউকে জোর

করে এসব করানোও ঠিক নয়। তবে হ্যাঁ, বন্ধুদের সাথে নিজের সমস্যাগুলো শেয়ার করতে পারলে অনেকেই মানসিকভাবে হালকা অনুভব করেন। তাই এমন সময়ে বন্ধু ও কাছের মানুষের সময় দেওয়াটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

বলেছিলাম এই লেখায় কোনো পরামর্শ থাকবে না। একটা অনুরোধ দিয়ে শেষ করি। আপনার যেই বন্ধুটি আজকাল অনেক বেশি একা একা থাকে, ঘর থেকে বের হতে চায় না, সব সময় মনমরা হয়ে থাকে, ওকে ভুল বুঝবেন না। হয়তো ও এমন কোনো একটা মানসিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যেটা ও কাউকে বলতে পারছে না। যদি সম্ভব হয় এমন কেউ হন যাকে ও সবকিছু নির্ভয়ে বলতে পারে। আপনি হয়তো ওর মানসিক রোগ সারিয়ে তুলতে পারবেন না, কিন্তু আপনি যদি শুধু ওর কথাগুলো মন দিয়ে শোনেন, তাহলে সে অন্তত বেশ অসময়ে একটা বন্ধু পাবে। মনে রাখবেন,

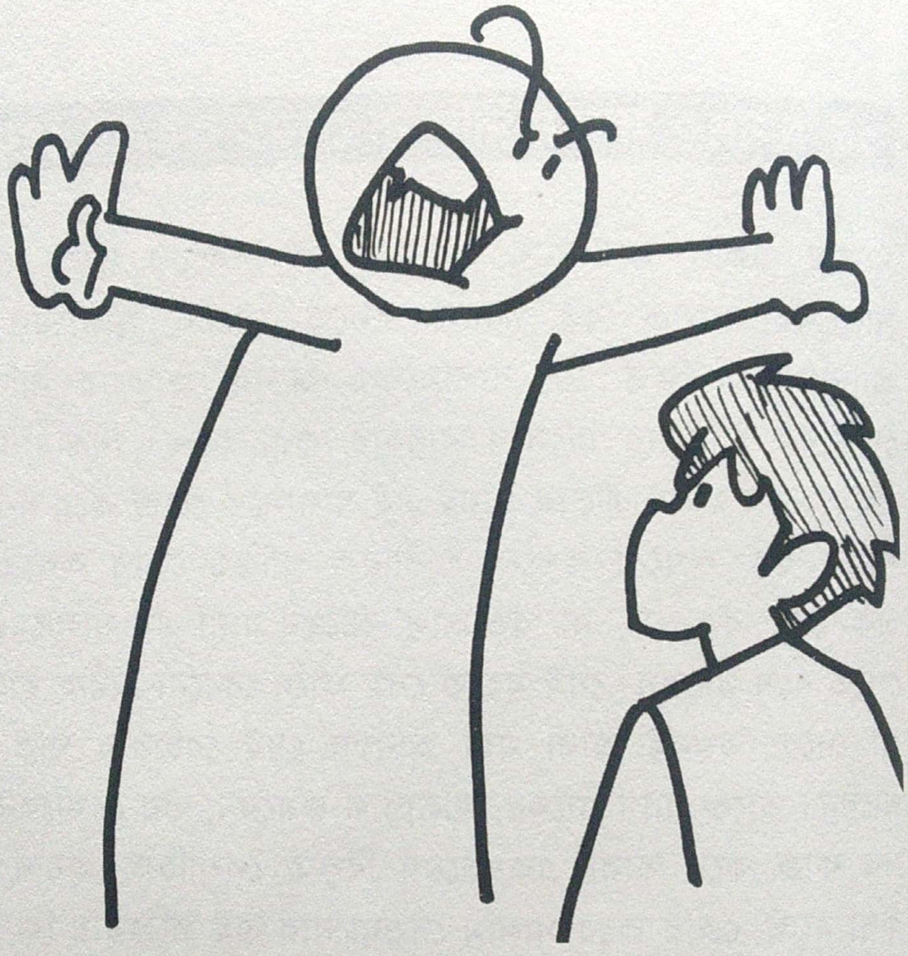
When you listen, you lessen the pain.

তুই আমাকে সালাম দিলি না কেন? কত্ত বড় বেয়াদব!

সালাম একটা অসাধারণ জিনিস। এই বইয়ের দুজন লেখকই সালামের অনেক বড় ফ্যান। বলতে পারেন সালামের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। কিন্তু এই সালামকেও অনেক জায়গায় রীতিমতো শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের প্রায়ই এই সালামকে কেন্দ্র করে বকাঝকা শুনতে হয়, কখনো কখনো শারীরিক শাস্তিও ভোগ করতে হয়। একদলের 'বড় ভাই' বা 'বড় আপু' আছেন যারা এই সালামের ফাঁদ পেতে বসে থাকেন। যেই মুহূর্তে সেই ফাঁদে কোনো নিরীহ ছাত্রছাত্রী পা দেবে, তখনই তারা মহা আনন্দে সেই বেচারার ঘাড় ভেঙে খাবেন। তাকে র‍্যাগ দেবেন, গালাগাল করবেন, ভয় দেখাবেন। এই সব কাজ করে তারা একধরনের বিকৃত পৈশাচিক আনন্দ পান। কথা হচ্ছে, জোর করে সালাম দেওয়ানোর এই প্রক্রিয়ায় কি আদৌ জুনিয়রদের মধ্যে সিনিয়রদের প্রতি সম্মান বাড়ছে? কিংবা এটা কি আদৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বৃদ্ধি করছে?

প্রথমত, দূর দিয়ে হেঁটে যাওয়া কোনো মানুষকে সালাম না দেওয়া দোষের কিছু হতে পারে না। এটা ছুটে যেতেই পারে। আবার সালাম দেওয়া মানেই যে ওই লোককে আপনি মহা সম্মান করেন তা-ও না। বরং যারা এভাবে জোর করে সালাম আদায় করেন, তাদের পেছনে আসলে সবাই গালমন্দ করে। সুতরাং এটা যে আপনার সম্মান বৃদ্ধি করছে না তা নিশ্চিত। দ্বিতীয়ত, এটা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা

বৃদ্ধি করে? একদমই না। বরং এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাগিং সংস্কৃতির একটা অংশ যা কিনা সরাসরি একটা অপরাধ। এভাবে নতুন ছাত্রদের ভয় দেখানো, তিরস্কার করা এগুলো কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ওই নতুন ছাত্রের সম্মান আরও কমিয়ে দিচ্ছে আর তাকেও মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল করে দিচ্ছে।

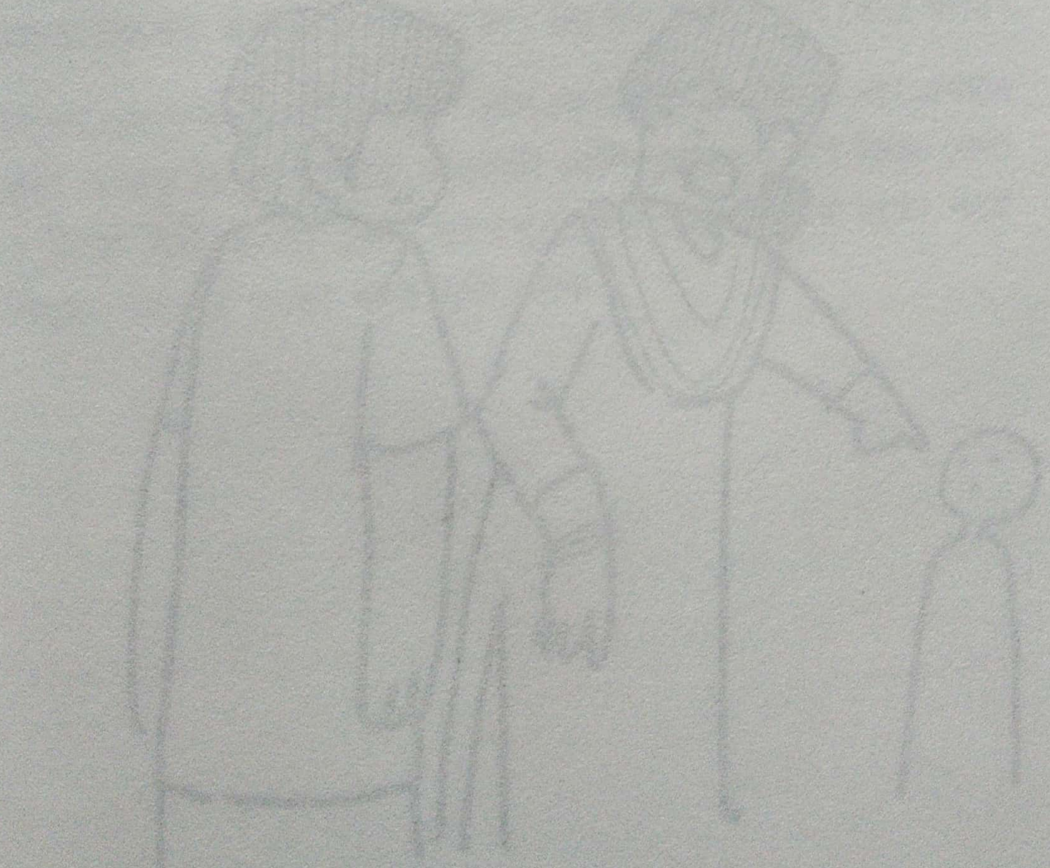


সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে সালামের মতো পবিত্র একটা অভ্যাসের। যেই সালামটা মানুষে মানুষে সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য বাড়ানোর কথা, সেটা মানুষের মধ্যে একটা ভয়ের সঞ্চার করছে। অনেকে আবার সালামের ব্যাপারেই শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছেন। চিন্তা করুন, আপনাকে যদি সালামকে কেন্দ্র করে এত অত্যাচার সহ্য করতে হয়, আপনি কি একটু হলেও শ্রদ্ধা হারাবেন না?

অথচ প্রকৃত ইসলামে সালামের সংস্কৃতি কিন্তু একদম অন্য রকম ছিল। সেখানে সিনিয়র-জুনিয়র, ধনী-দরিদ্র এমন কোনো ব্যবধান

ছিল না। সবাই সবাইকে সালাম দিতে পারবে এবং দেবে এমন একটা সংস্কৃতি ছিল। এমনকি হজরত মুহাম্মদ (সা.) নিজে তার সাহাবিদের সালাম দিতেন। অথচ আমরা সেই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে সালামের একটা সিঁড়ি বানিয়ে ফেলেছি, যেখানে কেবলমাত্র আপনার থেকে ওপরের স্তরের মানুষকে আপনি সালাম দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়ররা সিনিয়রদের সালাম দেবে, অফিসে কর্মচারীরা বসকে সালাম দেবে, বাসার দারোয়ান বাসার মালিককে সালাম দেবে ইত্যাদি।

এই সালামের সিঁড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। জুনিয়রদের কাছ থেকে জোর করে সালাম আদায় না করি। যদি কেউ দেখা হলে সালাম না দেয়, তাহলে তাকেই সালাম দিয়ে দিন না, সে যে বয়স বা পদমর্যাদার হোক না কেন। দেখবেন দ্বিতীয় দিন থেকে সে-ই আপনাকে সালাম দিচ্ছে বা সম্মান করছে। মনে রাখবেন, সালাম মানে 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'। জোর করে কি আর শান্তির বর্ষণ ঘটানো যায়?

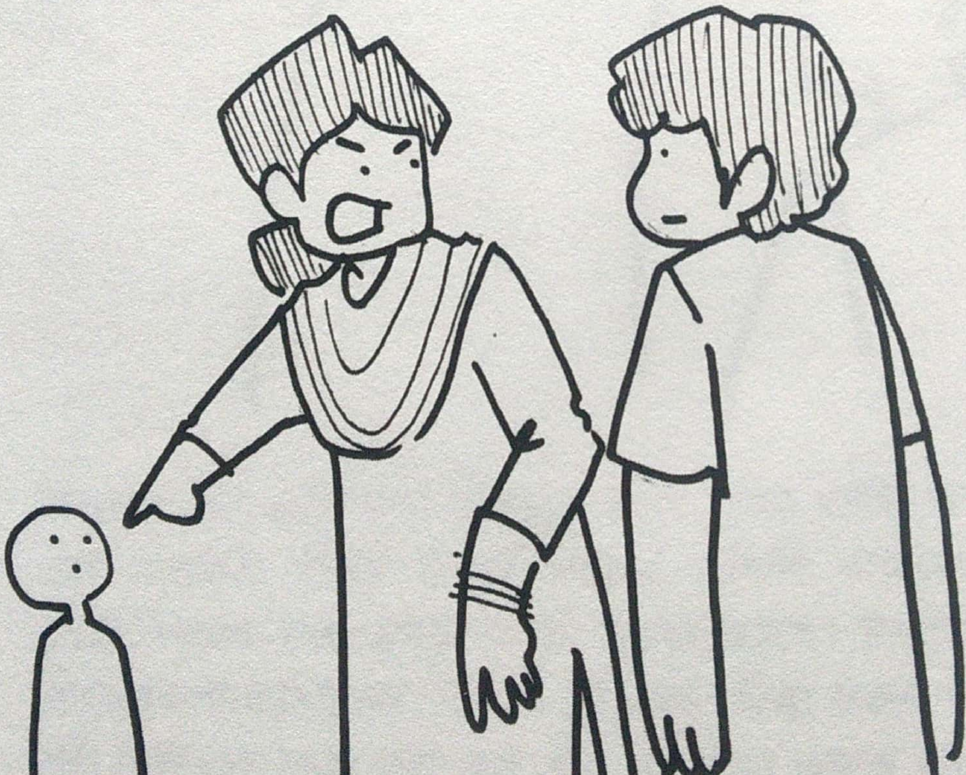


ওর পা ধুয়ে পানি খাও!

'রাকিন ৯৮ পেল, তুমি পাইলা না কেন?'

'তোমার ভাই এত মেধাবী, তুমি এ রকম কেন?'

'পাশের বাসার ছেলেটা সেন্ট জোসেফে চান্স পেয়েছে, আর তুমি? তুমি আমার মান ইজ্জত ডুবাবে।'



একটা শিশুর সাথে সবচেয়ে নিষ্ঠুর যে কাজটি আপনি করতে পারেন, তা হলো ওকে ওর বন্ধুর সাথে তুলনা করা। শিশুদের মধ্যে অদ্ভুত সুন্দর একটা সাম্য থাকে। ওরা ধনী-গরিব, বড়-ছোট, সাদা-কালো এত সব বিভেদ বোঝে না। বোঝে না বলেই সবার সাথে মেশে, সবার সাথে খেলে। ওদের মনে হয় সবার আগে আমরাই বৈষম্য করতে শেখাই। রোল নম্বরের মাধ্যমে। ও ফার্স্ট বয়, ও সেকেন্ড বয় আর তুমি লাস্ট বয়। ও ভালো, তুমি খারাপ। ও চালাক, তুমি বোকা। এ রকম হাজারটা বিভেদ চলে আসে সামনে। চিন্তা করুন, আমরা বড় মানুষরাও যখন দেখি বন্ধু এক লাখ টাকা বেতনের একটা চাকরি পেয়েছে আর আমি এখনো বেকার তখন আমাদেরই কত খারাপ লাগে। অথচ আমরা শিশুদেরও এত কষ্টের একটা অনুভূতির দিকে ঠেলে দিই।

যেই বন্ধুটার সাথে আপনি ওকে তুলনা করলেন, গতকাল পর্যন্তও হয়তো ওরা একসাথে খেলত। কিন্তু আজ হয়তো অপমানে ওর মুখের দিকেই তাকাতে পারবে না। ওর সব আত্মবিশ্বাস ভেঙে যাবে।

শৈশব খুব সুন্দর একটা সময়। এটা কোনো প্রতিযোগিতা না। এখানে অন্য কারও থেকে এগিয়ে যাওয়াটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না। নিজে শেখা ও নিজে সুখী হওয়া বেশি গুরত্বপূর্ণ। সব শিশু নিজের মতো করে শিখুক। নিজের মতো করে সুখী হোক।

তোমাদের কত আরাম, আমাদের সময় তো...

কখনো খেয়াল করেছেন, আমাদের আগের প্রজন্মের অনেকেই মনে করেন তাদের জীবন অনেক কঠিন ছিল, আর আমাদের জীবন অনেক সহজ? আমাদের বাবা-মাদের প্রজন্ম, এমনকি আমাদের বড় ভাইবোনরাও আমাদের প্রায়ই তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে বুঝিয়ে দেন যে আমাদের কষ্টগুলো আসলে কিছুই না। যত কষ্ট সব তাদের সময়ই ছিল। তাদের সময়ে পড়াশোনা আরও কঠিন ছিল, রাস্তায় চলাফেরা কঠিন ছিল, চাকরি, সংসার সবই কঠিন ছিল। আর যত দুনিয়ার আরামে আছি আমরা। তাই আমরা যখনই কোনো কিছু নিয়ে অভিযোগ করতে যাই, আমাদের শুনিয়ে দেওয়া হয়, 'আরে এটা তো কিছুই না, আমাদের সময় তো...'

হঠাৎ করে আমাদের সব কষ্ট কেমন জানি বাতিল করে দেওয়া হয়।

প্রথমত, একজনের কষ্টের কথা বলে আরেকজনের কষ্টগুলো ছোট বা মূল্যহীন প্রমাণ করার এই চেষ্টা আমার পছন্দ না। প্রতিটি মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা আলাদা হয় আর জীবনের কষ্টগুলোও আলাদা হয়। সাথে সাথে প্রতিটি মানুষের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতাও আলাদা হয়। আপনি জীবনে যত কষ্টই করেন না কেন, তাতে কিন্তু আপনার পরবর্তী প্রজন্মের কষ্টগুলো ছোট হয়ে যায় না।

দ্বিতীয়ত, মেনে নিচ্ছি যে বর্তমান প্রজন্ম অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করে আগের প্রজন্মগুলোর তুলনায়। আমাদের সময়ে যোগাযোগ অনেক সহজ হয়ে গেছে, বিনোদনের অনেক মাধ্যম বেড়ে গেছে,

প্রযুক্তি অনেক সামনে এগিয়ে গেছে। কিন্তু একই সাথে আরও অনেক সমস্যা নতুন করে তৈরি হয়েছে যেগুলো আমাদের আগের প্রজন্মের মানুষকে সহ্য করতে হয়নি। যেমন—

১. আমাদের প্রজন্মে হঠাৎ করে জনসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। আগের প্রজন্ম যেখানে খোলা খেলার মাঠ পেয়েছে সেখানে শুধু দালান আর দালান। রাস্তায় পা ফেলার জায়গা নেই আমাদের জন্য।

২. আমাদের প্রজন্ম অকল্পনীয় প্রতিযোগিতার মধ্যে বড় হচ্ছে। শিক্ষা, চাকরি থেকে শুরু করে যেকোনো সুযোগের জন্য হাজার হাজার মানুষের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে।

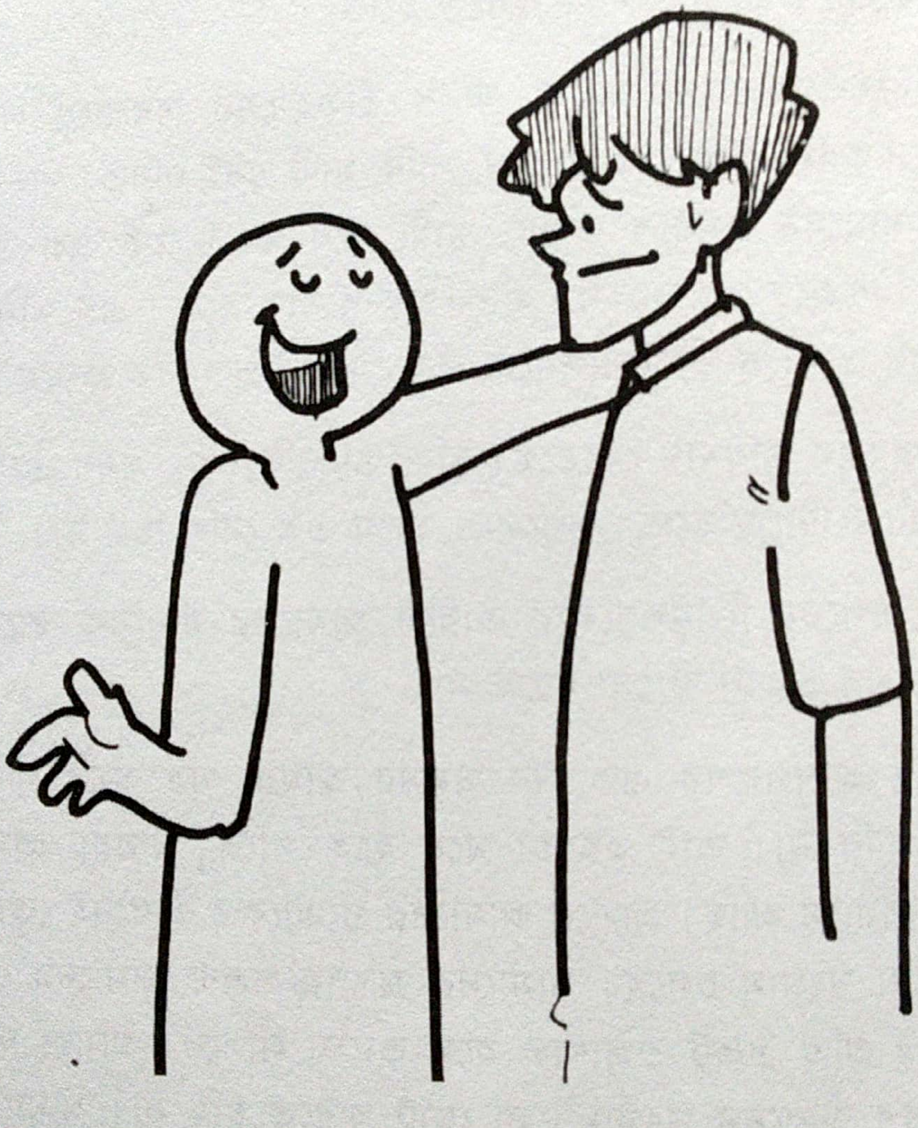
৩. পরিবেশগতভাবে আমরা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে আছি। আমাদের বাতাস, পানি, মাটি সবই দূষিত। পৃথিবীতে আদৌ মানুষের বসবাস কতটা স্থায়ী হবে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে এখন। বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে। এই পরিবেশ আমাদের স্বাস্থ্য ও জীবনযাপনকে ভীষণ রকম প্রভাবিত করছে।

৪. অপরাধের পরিমাণ বেড়েছে। চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ এসবের ভয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। এগুলোও আগে এত বেশি ছিল না।

৫. এই ওপরের জিনিসগুলোর কারণে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থাও খুব একটা ভালো যাচ্ছে না।

আমাদের আশপাশের এত সব সমস্যা আমরা সব সময় গুছিয়ে বলতে পারি না। তাই হয়তো মনে হতে পারে, আমরা আসলে অনেক আরামে আছি। আসলে আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কোনো না কোনো সংগ্রাম চলছে। আমাদের আগের প্রজন্ম আমাদের সেই সংগ্রামের প্রতি একটু শ্রদ্ধাশীল হলে ভালো লাগবে। আমরা কিন্তু আপনাদের জীবনের সংগ্রামগুলো ছোট করতে চাই না। আমাদের আগের প্রজন্মের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন। সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা দেখেছেন। তাই আমাদের কষ্টগুলো তাদের কাছে ছোট মনে হওয়ারই কথা। কিন্তু ওই যে বললাম, সবার কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতাও অন্যের থেকে আলাদা।

তুই যে পারবি না এটা আমি আগেই জানতাম!



এক দল লোক আছে, যারা আপনার ছোট ব্যর্থতাগুলো হতাশার কারণ বানিয়ে তোলে। 'আমি তো আগেই জানতাম তুমি পারবা না', 'হায় হায় এখন কী করবা?' 'তুমি তো একটা ফেইলিউর।' তাদের ভাবটা এমন যেন এই একটা ঘটনায় আপনার জীবন শেষ

হয়ে গেছে। ধরুন আপনি একটা পরীক্ষায় ফেল করেছেন। আপনার মন-মেজাজ এমনিতেই খারাপ। তখন কানের কাছে এসব বলতে থাকলে কার ভালো লাগে বলুন। তবে এটার আরও একটা ভয়াবহ ফল আছে। ব্যর্থতার প্রতি একটা প্রকট ভয় জন্মে যায়। আপনি অঙ্ক পরীক্ষার সময় এমনিতে যতটুকু নার্ভাস থাকতেন এখন আরও বেশি ভয় পাবেন। কারণ আপনার মনের মধ্যে কাজ করবে, যদি কম নম্বর পান তাহলে আপনাকে কী কী খারাপ কথা শুনতে হবে।

আচ্ছা, আমরা ব্যর্থতাকে এত অপছন্দ করি কেন? এটা তো জীবনেরই একটা অংশ। যে আপনাকে খারাপ কথা শোনাচ্ছে, সে কি জীবনে ফেল করে নাই? নিশ্চয়ই করেছে। হয়তো করেছে বলেই আপনাকে খারাপ কথা শুনিয়ে সে তার মনকে শান্ত করতে চাচ্ছে।

এসব খারাপ কথাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার পদ্ধতি কী? আমি বেশ কয়েকটা কাজ করি, বেশ কাজে দেয়। প্রথমত, নিজের ব্যর্থতাকে ছোট করে সেলিব্রেট করি। সবাই তো জয় সেলিব্রেট করে, ব্যর্থতার একটা সেলিব্রেশন দরকার না? আমরা কোনো প্রতিযোগিতায় হেরে গেলে সাধারণত রেস্টুরেন্টে গিয়ে গ্রিল চিকেন বা চিকেন শর্মা খাই। এতে হেরে যাওয়ার কষ্টটা একটু মেরামত হয়। দ্বিতীয়ত, পরাজয়ের একটা পোস্ট মর্টেম করি। কী কী ভুল করেছি একটু বোঝার চেষ্টা করি। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করি, এই ভুল আর করা যাবে না। আর যেসব ঘাটতির কারণে হেরে গেছি, সেগুলো আরও ভালো করে রপ্ত করতে হবে। তৃতীয়ত, যারা কটু কথা বলছে, তাদের পাত্তা দেওয়া লিস্ট থেকে একদম বাদ দিয়ে দিই। তার মানে, তাদের কথাকে পাত্তা দেব না বলে প্রতিজ্ঞা করি।

ব্যর্থতা জিনিসটা আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে কতটা ভূমিকা রাখে তা আমরা ঠিক বুঝি না। আমরা ঠিক করেছি ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানদের কোনো একটা প্রতিযোগিতামূলক খেলা বা কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করব। সেটা খেলা শেখানোর জন্য নয়, পরাজয় শেখানোর জন্য। যারা ছোটবেলায় হারতে শেখে না, তারা বড় হয়ে মনে করতে থাকে, সফলতাই জীবনের প্রধান অংশ। সফলতার বাইরে আর

কোনো কিছু তারা নিতে পারে না। তারা সফলতার জন্য অপেক্ষা করতে শেখে না। ব্যর্থ হলে হতাশ হয়ে পড়ে। তাই আমি মনে করি, জীবনে ছোট ছোট ব্যর্থতা অনেক দরকার।

আমরা বলছি না পরাজয় মেনে নেওয়া সহজ। আর পরাজয়ের সময় এসব কটু কথা শোনা তো আরও কঠিন। কিন্তু সব সময় মনে রাখবে,

"What doesnt kill you, makes you stronger."

যে আঘাত সহ্য করে তুমি বেঁচে আছ, সেই আঘাত তোমাকে আরও শক্তিশালী করবে।

ড্যুড, তুমি ইংরেজি বলতে পারো না? হাহাহা!

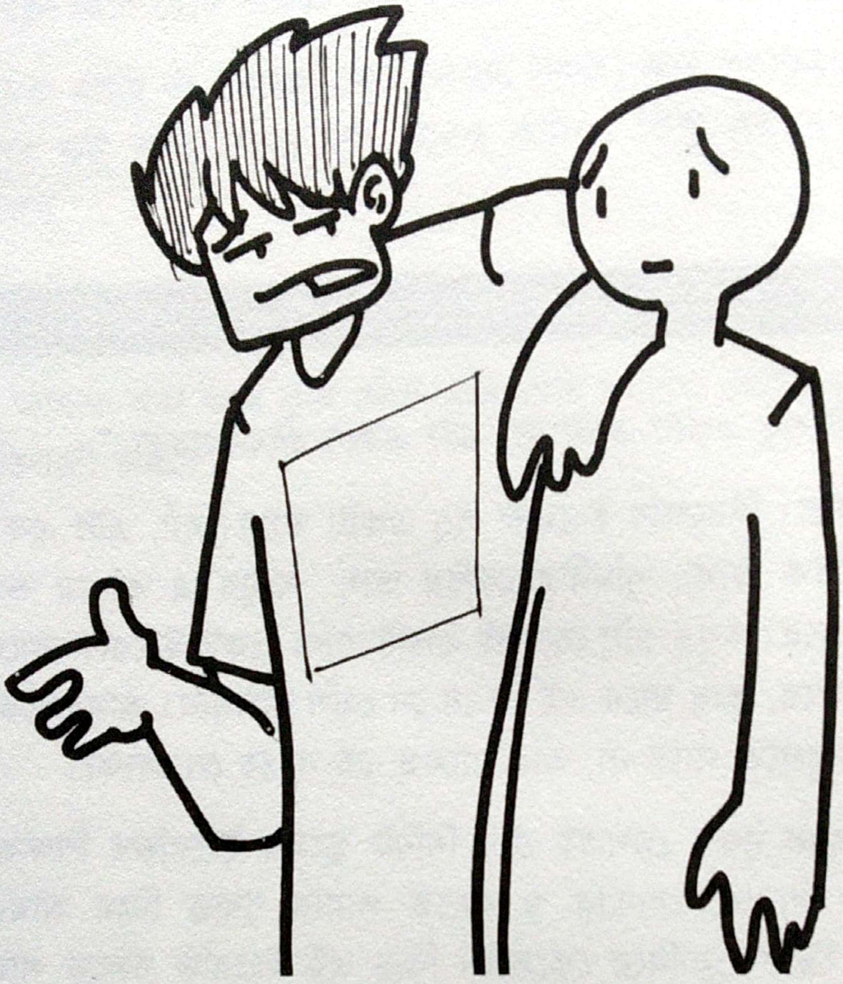
"ইংরেজি শুধু একটা ভাষা না, এটা একটা জীবনব্যবস্থা।"

মিথ্যা কথা। দিনশেষে ইংরেজি শুধু একটা ভাষা। হ্যাঁ, এটা একটা আন্তর্জাতিক ভাষা, পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ এ ভাষায় কথা বলতে পারে। তবুও এটা কেবলই একটি ভাষা। কেউ ইংরেজি ভালো বলতে পারে, তার মানে এই না যে সে বেশি বুদ্ধিমান। আবার কেউ ইংরেজি বলতে পারে না, তার মানেও এই না যে সে বোকা।

এই বইয়ের দুজন লেখকই টেন মিনিট স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক। ইংরেজি জানার, বোঝার ও বলতে পারার গুরুত্ব নিয়ে আমরা অসংখ্য ভিডিও বানিয়ে ফেলেছি। কিন্তু এই ইংরেজি বলতে পারা না-পারাকে কেন্দ্র করে যে এক ধরনের বৈষম্য তৈরি হয়েছে, তা আমাদের ছাত্রদের জন্যও অত্যন্ত ক্ষতিকর আবার ইংরেজি শিক্ষার জন্যও খুব ক্ষতিকর।

চিন্তা করে দেখো, তুমি ভালো ইংরেজি বলতে পারো, তার জন্য কিন্তু অনেকগুলো পারিপার্শ্বিক বিষয় দায়ী। তুমি হয়তো ভালো একটা স্কুলে পড়াশোনা করেছ। তোমার আশপাশে হয়তো অনেকেই ইংরেজিতে কথা বলত যাদের থেকে তুমি শিখেছ। হয়তো তোমার ইংরেজি শেখার মতো একটা পরিবেশ ছিল। যে মানুষগুলো ইংরেজি পারে না বলে তুমি হাসাহাসি করছ, তারা অনেকেই হয়তো এই সুবিধাগুলো পায়নি। অনেকের স্কুলে হয়তো ইংরেজি বলার চর্চাই ছিল না। অনেকে হয়তো নিজে শিখতে চাইত, কিন্তু ইংরেজি বললেই

আশপাশের মানুষজন ওকে ক্ষেপাত। এত প্রতিবন্ধকতার ভিড়ে ওর যে ইংরেজিটা শেখা হয়ে ওঠেনি, এটা কি ওর দোষ?



এবার বলি, এই মানসিকতাটা ইংরেজি শেখার জন্য অনেক ক্ষতিকর কেন। শুদ্ধ ইংরেজি বলতে পারাকে স্মার্টনেসের পরিমাপক হিসেবে ধরা হয় বলেই অধিকাংশ মানুষ এটাকে সব থেকে বেশি ভয় পায়। এটা না পারলে যেন জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। অনেকে আছেন, যাদের বদঅভ্যাস আছে কথায় কথায় ইংরেজির ভুল ধরার এবং যারা ভুল করছে তাদের নিয়ে উপহাস করার। এসব মানুষের সামনে ইংরেজি বলতে গেলে যেকোনো মানুষ নার্ভাস হয়ে পড়ে। অনেকে ভুল করার ভয়ে বলাই ছেড়ে দেয়। অথচ এটাকে যদি জীবন-মরণ বিষয় হিসেবে না দেখে সহজভাবে দেখা হতো, তাহলে কেউ ভুল করতে ভয় পেত না। সবাই অনেক সহজেই ইংরেজি বলতে পারত।

ইংরেজি শেখা ও শেখানোর ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলানো দরকার। আমরা যারা ইংরেজি পারি, তারা এটা নিয়ে অহংকার না করে যদি আর পাঁচজন মানুষকে এই ভাষাটা শেখাতে পারি, তাহলে ওই মানুষগুলোর অনেক উপকার হতো। হয়তো একটা চাকরি পেতে সুবিধা হতো বা পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে সুবিধা হতো। শুধু শুধু টিটকারি দিয়ে যে কারোরই লাভ হচ্ছে না, তা নিশ্চিত বলতে পারি।

হিজড়াদের মতো করিস কেন?

মানব সমাজে ছেলে আর মেয়ের বাইরেও একটি জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ থাকে। (যদিও আধুনিক জেন্ডার শাস্ত্র বলছে জেন্ডার ২৬ ধরনের বা আরো বেশি)। এই তৃতীয় জেন্ডারের মানুষকে ইংরেজিতে হার্মাফ্রোডাইট, ভালো বাংলায় বৃহন্নলা আর চলতি বাংলায় হিজড়া বলে।

আমাদের সমাজে হিজড়া একটা গালি। হিজড়াদের কেউ ভালোবাসে না। সবাই ঘেন্না করে। আবার অনেকে ভয়ও পায়। পাবারই কথা। রাস্তা ঘাটে হিজড়াদের আক্রমনে অনেক বিব্রতকর কিংবা বিপদজনক অবস্থায় পড়তে হয়। কিন্তু এই তৃতীয় জেন্ডারের মানুষগুলো সবকিছু বাদ দিয়ে কেন এই রাস্তাঘাটে মানুষকে হেনস্তা করা বা চাঁদাবাজির পথ বেছে নেয়, তা কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি?

আমাদের সমাজে হিজড়াদের খুব নির্মম একটা ইতিহাস আছে। কোথাও কোনো হিজড়ার জন্ম হলে বেশির ভাগ পরিবারই ঐ শিশুকে পরিত্যাগ করে। তারপর তাকে হিজড়া সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দেয়া হয়। চিন্তা করতে পারেন? নিজের সন্তানকে একজন বাবা-মা ত্যাগ করছেন, কেবল মাত্র সে সন্তানটি তৃতীয় জেন্ডারের বলে। হিজড়া সম্প্রদায়ে যাওয়ার পর শুরু হয় তাঁর মানবেতর জীবন। পড়ালেখা করবার কোনো সুযোগ নেই কারণ কোনো স্কুল হিজড়া বাচ্চা ভর্তি করতে চায় না। ওদের বন্ধু বলতে আশেপাশের অন্য হিজড়া বাচ্চারাই। বাইরের কেউ ওদের সাথে বন্ধুত্বও করে না।

এরপর প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরে সে দেখে তাকে কেউ কোনো কাজেও নিতে চায় না। অথচ সে কিন্তু পুরোদস্তুর শক্ত সমর্থ একজন মানুষ। সে যেকোনো কাজের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম। কিন্তু তাকে কোনো কাজে নেয়া হবে না। এভাবেই সে বাধ্য হয় চাঁদাবাজি বা অন্যকে হেনস্তার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে। কিন্তু এই কাজের মাধ্যমে তারা সমাজে আরো বেশি ঘৃণিত হয়ে ওঠে। অথচ আমরা ভুলেই যাই যে তারা আমাদের অবহেলা ও নিগ্রহের শিকার হয়েই এই খারাপ কাজে এসেছে।

এই পৃথিবীতে যত শোষিত গোষ্ঠী ছিল আস্তে আস্তে সবারই কোনো না কোনোভাবে কিছুটা হলেও সামষ্টিক উন্নয়ন ঘটেছে। আফ্রিকা ও আমেরিকার কালো মানুষের নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে শিখেছেন। নারীরা সম-অধিকারের জন্য ছুটছেন। কেবলমাত্র এই তৃতীয় জেন্ডারের মানুষের মুক্তি আর আসছে না। তারা থেকে যাচ্ছে অবহেলিত, নিগৃহীত, ঘৃণিত।

আসুন, ঘৃণার চক্র থেকে এই মানুষগুলোকে বেড়িয়ে আসতে সাহায্য করি। এটা হতে হবে সমাজের সব স্তরে। আমাদের স্কুলগুলোতে হিজড়া বাচ্চাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সরকার তৃতীয় জেন্ডারের মানুষদের ট্রাফিক পুলিশ, দাড়োয়ান ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত করছে, যা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এভাবে সকল কর্মস্থলে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সম্পূর্ণ শক্ত সমর্থ কিছু মানুষ শুধুমাত্র সামাজিক নিপীড়নের শিকার হয়ে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে থাকবে– এটা দেশের অর্থনীতির জন্যেও খারাপ সংবাদ।

আর সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা আসতে হবে আমাদের থেকে। এই তৃতীয় জেন্ডারের মানুষকে সম্মান করতে হবে। হয়তো এটারই প্রথম ধাপ 'হিজড়া' শব্দটিকে গালি হিসেবে ব্যবহার না করা। তাদেরকে মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখুন। একদিন তারাও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠবেন।

তুমি তো ইংলিশ মিডিয়ামের ফার্মের মুরগি

‘ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলেমেয়েগুলো একটু কেমন না? কেমন বাংলা আর ইংলিশ মিশিয়ে কথা বলে। ঘনঘন ফাস্টফুড খেতে চায়। আর কথায় কথায় ঢং করে। দুনিয়া দেখে নাই তো! মাম্মি-ড্যাডি পোলাপান।’



আমিও ক্লাস সেভেন-এইট পর্যন্ত এ রকমই ভাবতাম। ইংলিশ মিডিয়ামের কারও সাথে মিশতে ভয় পেতাম। ওদের কেমন এলিয়েন মনে হতো। ক্লাস এইটে যখন ইংরেজি বিতর্কের সাথে জড়িত হলাম তখন ইংলিশ মিডিয়ামের কিছু বন্ধু হলো। অবাক হয়ে খেয়াল করলাম যে ওরা একদম আমাদের মতো। ওরাও বাবা-মার থেকে লুকিয়ে ফুচকা খায়, ঈদের সালামির টাকা জমিয়ে ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট কেনে, রাত জেগে সিনেমা দেখে আর কোচিংয়ে গিয়ে সারাক্ষণ হাসাহাসি করে। হ্যাঁ, কেউ কেউ হয়তো একটু অন্যভাবে কথা বলে, কিন্তু পরিচিত হয়ে গেলে ওটা আর কানে লাগে না।

ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল ধারণা যে ওরা কখনো বাস্তবতার সম্মুখীন হয়নি। বাবা-মার অতি আদরের সন্তান। এটা সত্যি যে এমন অনেক ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রই আছে যারা বাবা-মার অতি আদরের সন্তান, কিন্তু এটা তো অনেক বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রের জন্যও সত্য। আবার এমন অনেক ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রকে চিনি যারা লোকাল বাসে করে স্কুলে যাতায়াত করে, পাড়ার চিপা গলিতে ক্রিকেট খেলে, কাদা মাটির মধ্যে বেড়ে ওঠে। সুতরাং এ ধরনের জেনারালাইজেশন নিতান্তই অমূলক। তবুও তর্কের খাতিরে ধরে নিই, ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্ররা বাবা-মার অতি আদরের সন্তান। কিন্তু এটা কি তাদের দোষ? একটা মানুষের জীবনের বাস্তবতা তোমার থেকে ভিন্ন হতেই পারে। তার মানে এই না যে সে তোমার বন্ধু হতে পারবে না। বরং বন্ধুত্বের সব থেকে সুন্দর দিক হলো একদম অন্য রকম একটা মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখগুলো বুঝতে শেখা। তুমি যদি ওর জীবনটাকে বুঝতে শেখো, ওর অনুভূতিগুলোকে মূল্য দাও, দেখবে সে-ও তোমার অনুভূতিগুলোর মূল্য দেবে।

ভাবি কিছু করেন না, নাকি হাউজওয়াইফ?

আরিফ আর হোসাইন, Chief Evangelist, টেন মিনিট স্কুল

মাঝে মাঝে, আমি নিজেও এই ভুলটা করি।

হয়তো কোনো ভদ্রলোকের সাথে কথা বলছি, একপর্যায়ে জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'ভাবি কী করেন? কোথাও কিছু করছেন? নাকি হাউজওয়াইফ।'

... চরম কাণ্ডজ্ঞানহীন একটা প্রশ্ন এটা!

বাসায় তিনি কী করছেন আমরা কি দেখছি না? নাকি দেখেও না দেখার ভান করছি?

সকালে বাসার সবার রুটি বানানো থেকে শুরু করে...মেয়েদের স্কুলের টিফিন রেডি করে...তাদের রেডি করে...তাদের চুল সুন্দর করে বেঁধে সময়মতো স্কুলে পৌঁছে দেওয়া।

আর আমি নবাব; আউলাঝাউলা চুলে উঠে– 'আজ পরোটা নাই?'

ধ্যামড়া আমি, সকালে নাশতার টেবিলেও সুইট ডিশ খুঁজি... 'সুজি নাই আজকে?'

সে দৌড়ে পাউরুটিতে জেলি লাগিয়ে দেয়। কচকচ করে গুঁড়ামুড়া ছিটায়ে আমি টোস্ট করা পাউরুটি খেয়ে অফিসে চলে আসি।

তারপরও আমাদের প্রশ্ন, 'ভাবি কিছু করেন? নাকি হাউজওয়াইফ?'

সারা দিন অফিসে থেকে সন্ধ্যায় লাট সাহেবের মতো বাসায় এসে বলি, 'বিকেলের নাশতাটা আজকে অনেক পুওর হইসে।'

রাতে খেতে খেতে বলি, 'টমেটো কই...সালাদ ছাড়া খাওয়া যায়?'

'তরকারির সংখ্যা কম লাগে কেন?...টেবিল তো ঠিকই ভুইত্তামারা কেনাইছ?'

বউ সাথে সাথে বলে, 'ডিম ভেজে দেব?'

রাতে চিত হয়ে ঘুমাই...খাটের চারটা বালিশের মধ্যে তিনটাই আমার হাত-পা-মাথার নিচে।

নিজের জুতাটা নিজে রং করিনি কোনো দিন।

কিন্তু একবারও ভাবিনি, জুতাটা কি অটো রং হয়ে আসছে?

মাঝে মাঝে রেডি হতে হতে বউকে খোঁচা দিয়ে বলি, 'মোজার ডিভোর্স রেট কি বেড়ে গেছে নাকি? দুইটা দুই রকমের মোজা কেন?'

হাসিমুখে সে উপুড় হয়ে ড্রয়ার থেকে মোজা মিলিয়ে দেয়।

তারপরেও কেউ... 'ভাবি কিছু করেন? নাকি হাউজওয়াইফ?' প্রশ্ন করলে গায়ে লাগে না?

... সেই আমলে, এমএ পাস করা আমার মায়ের কথা যখন আব্বাকে কেউ চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করত, 'ভাবি কী করেন? কোথাও কিছু করছেন? নাকি হাউজওয়াইফ?'

তিনি উত্তর দিতেন, 'না, হাউজওয়াইফ না...সে আমার দুই ছেলেকে মানুষ করে...তা-ও বিনা বেতনে। সে হাউজওয়াইফ না...সে তিনটা স্বপ্ন পূরণে ব্যস্ত...আমি কর্মজীবী বাট সে স্বপ্নজীবী। সে একাধারে আমার হাউজ এবং ওয়াইফ, দুটাই। শব্দ দুটোর মাঝে গ্যাপ দিতে হবে ভাইসাহেব...হাউজ এবং ওয়াইফ। এ কী...বিস্কুট চিবানো থামায় দিলেন যে?'

সায়েন্স পড়ে আবার বিবিএ পড়ে নাকি কেউ?

আরিফ আর হোসাইন, Chief Evangelist, টেন মিনিট স্কুল

স্কুলে ক্লাস এইটের আগের সময়গুলো কিছুটা টর্চার সেলের মতো। ছেলে সায়েন্স পাবে নাকি আর্টস পাবে...এটা নিয়ে মোটামুটি বাসার সবার নাওয়াখাওয়া বন্ধ।

আমার নিজেরও মনে আছে আমি যদি সায়েন্স না পাই তাহলে আমার মরে যাওয়া ভালোটাইপ একটা ফিল আমি ফ্যামিলি থেকে পেয়েছিলাম। অথচ আমাকে কেউই জিজ্ঞেস করেনি আমার কী পড়তে ভালো লাগে।

আমি নিশ্চিত এ রকম বাস্তবতার সম্মুখীন কম-বেশি আমরা সবাই হয়েছি...এবং এখনো হচ্ছি।

আসলে আমাদের বাবা-মায়ের প্রজন্মের মাথায় ঢুকেই গিয়েছিল যে বড় কিছু হওয়া মানে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়া... এর বাইরে কিছু না। আর ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে সায়েন্স তো নেওয়াই লাগবে। অথচ যে ছেলেটা শিল্পকলায় পড়তে চায় বা যুক্তিবিদ্যায় পড়তে চায় বা সমাজবিজ্ঞানে বা অর্থনীতিতে, তাকেও এই প্রেশার ফিল্টারের মাঝ দিয়ে যেতে হয়। ফলাফল, তখন আমরা আর আমরা থাকি না। এবং তার ফলে আজকে আশপাশে তাকালেই প্যাশন আর প্রফেশন এক না এ রকম ভুরি ভুরি ছেলে আশপাশে পাওয়া যাবে।

এর একমাত্র কারণ আমাদের সিস্টেম...আমাদের সমাজব্যবস্থা।

সেটা যে সেই ক্লাস এইটের আগে থেকে শুরু হয়, চলতে থাকে একদম শেষ পর্যন্ত।

আপনি ইউনিভার্সিটি লাইফে এসে সায়েন্সের সাবজেক্ট বাদ দিয়ে আপনার শখের সাবজেক্টে যাবেন (যেমন ইংরেজি সাহিত্যে পড়বেন) সেই আমাদের সিস্টেম তথা সমাজব্যবস্থা আপনাকে আঁকড়ে ধরবে।

আপনি টেকনোলজির পাশাপাশি একটা ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি নেবেন ভাবছেন?

আপনার আপন চাচাই বলবে, 'সায়েন্স পড়ে আবার বিবিএ পড়ে কেউ?'

অথচ আজ বিশ্ব চলছে এ রকম কম্বিনেশন ডিগ্রিধারী মেধাবীদের দিয়েই। সেই খোঁজ তো চাচা রাখে না... কিন্তু আমরা তো অন্তত রাখি।

আসল প্রবলেমটা হচ্ছে এই সিস্টেম বা সমাজব্যবস্থা...যে নামেই একে ডাকি, এটা আমাদের নিজেদেরই তৈরি।

এটা থেকে বের হতে চাইলে এই আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

কীভাবে?

আমরা যারা ধীরে ধীরে প্যারেন্টস জেনারেশন হচ্ছি...এই আমরা যদি এখন মাথায় গেঁথে ফেলি, 'আমি আমার সন্তানকে তা-ই বানাব যেটা সে মন থেকে হতে চায়' ... তাহলেই কিন্তু এক নিমেষে আমরা গুঁড়িয়ে দিলাম এই সিস্টেম।

সেদিন এক আত্মীয় আমাদের বাসায় এসে আমার ছোট মেয়েকে দেখে তার গাল ধরে প্রশ্ন করছে, 'মামণি, তুমি বড় হয়ে কী হবে?'

সে উত্তর দিল, 'আমি বড় হয়ে আমিই হব।'

আত্মীয় শকড!

আসলেই তো...আমার মেয়ে তো ময়দার দলা না যে তাকে দিয়ে রুটি বানানো হবে নাকি পরোটা, নাকি লুচি, সেটা অন্য কেউ ঠিক করবে।

সেটা আমি-আপনিইবা ঠিক করার কে?

আমরা বরং তাকে গাইড দিতে পারব...ব্যস...এটুকুই

এই কাজটাই শুরু করি আমরা প্যারেন্টস জেনারেশনরা...ট্রাস্ট মি, আগামী ১০-১৫ বছর পর এমন একটা প্রজন্ম আমরা পেতে যাচ্ছি যেখানের সবারই প্যাশন আর প্রফেশন এক থাকবে।

দেখি তখন কে থামায় এই বাংলাদেশকে!

আরে! একবার-দুইবার খেলে কিছুই হবে না!

শামীর মোন্তাজিদ, ফর্মার চিফ অপারেটিং অফিসার, টেন মিনিট স্কুল

আসক্তি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। আসক্তি যে কেবল মাদকদ্রব্যের প্রতিই সৃষ্টি হয় তা কিন্তু নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে চিনিযুক্ত খাবার, যৌনমিলন, জুয়ো খেলার প্রতিও আসক্তি সৃষ্টি হতে পারে। মজার ব্যাপার হলো, এই সব ধরনের আসক্তি সৃষ্টির পেছনের বিজ্ঞানটায় বেশ মিল রয়েছে।

একটা ব্লু বেরি চিজ কেক খাওয়া শুরু করলে থামানো কিন্তু বেশ কষ্টকর। ভালো একজন সঙ্গীর সাথে যৌনমিলনও মানুষ বারবার করতে চায়। কিন্তু কেন?

সবকিছুর শুরু আমাদের মাথার ভেতরে। আমাদের মস্তিষ্কের মাঝে নিউক্লিয়াস আকুমবেন নামক একটা অংশ রয়েছে যেখানে 'ভালো লাগার জৈবিক বিক্রিয়া' বা 'Pleasure Pathway' সংঘটিত হয়। এই অংশের অন্যতম কাজ হলো যা ভালো লাগে সেই জিনিসটাকে আরও একটু ভালোবাসতে শেখানো। ধরুন, আপনার প্রিয় খাবার হলো বার্গার। এখন বার্গার খেলে আপনার নিউক্লিয়ার আকুমবেনস থেকে ডোপামিন নামক এক বস্তু নিঃসরিত হবে। সেই ডোপামিন গিয়ে উজ্জীবিত করবে ডেলটা FosB নামক এক প্রোটিনকে। এই ডেলটা FosB হলো সব নষ্টের গোড়া।

ডেলটা FosB একবার উত্তেজিত হলে সে অনেকক্ষণ সেই আমেজটা ধরে রাখতে পারে। যার ফলে বার্গার খাওয়ার ভালো লাগা ভাবটা আমাদের মাঝে বেশ অনেকক্ষণ ধরে বজায় থাকে। আপনি একটা বার্গার খেয়ে শেষ করতে না করতেই আরেকটা বার্গার খাওয়ার ধান্ধা করতে থাকেন। এই ঘটনাকে নিউরো বায়োলজিতে বলা হয় 'পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট'। অর্থাৎ, যা ভালো লাগে সেটাকে আরও বেশি বেশি চাওয়া।

তাহলে কি আমরা বার্গার খেলেই আসক্ত হয়ে যাব?

না! এত সহজ না। এই ডেলটা FosB প্রোটিনকে দমন করার জন্য আমরা ডেলটা JunD নামের একটি প্রোটিন শরীরে প্রকাশ করে থাকি। সোজা বাংলায় ডেলটা JunD ডেলটা FosB-কে বাধা দেয় এবং আমাদের সেই পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট স্থায়ী হয় না। অর্থাৎ, আমাদের শরীরের 'Pleasure Pathway'-এর মাঝেই সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় রয়েছে। তাই বার্গার আরেকটা খেতে ইচ্ছা করলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। Thanks to delta JunD.

তাহলে, আসক্তি সৃষ্টিই বা কেন হবে? সবই তো দেখি নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালে আবদ্ধ।

কোকেইন, ইয়াবা, ক্রিস্টাল মেথের মতো নেশার দ্রব্যগুলো মস্তিষ্কের সেই 'Pleasure Pathway'-কে হাইজ্যাক করে। চিজ কেক খেলে আপনার নিউক্লিয়াস আকুমবেনে যে পরিমাণ ডোপামিন বের হয় তার তুলনায় কয়েক হাজারগুণ বেশি ডোপামিন নিঃসৃত হয় কোকেইন, ইয়াবা খেলে। আপনার শরীর তখন বুঝে উঠতে পারে না এই বিশাল ডোপামিনের ঝড়কে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে।

এই সুযোগে ঈদ শুরু হয় ডেলটা FosB-এর জীবনে। কারণ মূলত দুটো।

এক. বিশাল ডোপামিনের সমুদ্রে ডেলটা FosB প্রায় মাসখানেক পর্যন্ত সক্রিয় থাকতে পারে। একবার ভেবে দেখুন, বার্গার খাওয়ার

এক ঘণ্টা পর কিন্তু এই ডেলটা FosB নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তাই আপনার মনে একটা বার্গার খাওয়ার এক ঘণ্টা পর আরেকটা বার্গার খেতে সাধারণত ইচ্ছে করে না। অন্যদিকে মাদকদ্রব্যের সমস্যা হলো, এটা খাওয়ার প্রায় এক মাস পর্যন্ত তার প্রভাব আমাদের মস্তিষ্কে বজায় থাকতে পারে। এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয়বার সেই বস্তু গ্রহণ করলেই ব্যস! আপনি সেই দুষ্টচক্রে বাঁধা পড়ে যাবেন। আপনি হয়তো মনে মনে ভাবছেন, আরে! একবার খাওয়ার পর সেই ডেলটা FosB-এর তাড়না আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। যদি সেটাই ভেবে থাকেন তাহলে একবার মনে মনে চিন্তা করে দেখুন, 'আপনি কি চাইলেই পর্নো দেখা বন্ধ করতে পারবেন?'

দুই. বিশাল ডোপামিনের সমুদ্রে ডেলটা JunD ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। ফলে ডেলটা FosB-কে কন্ট্রোল করারও কেউ থাকে না। ফলে আপনি পরিণত হবেন সেই মাদকদ্রব্যেবর গোলামে। ব্যাপারটা অনেকটা পুলিশকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে ডাকাত ডেকে আনার মতো ঘটনা।

সংক্ষেপে বলতে গেলে: একবার ইয়াবা খেলে আপনার মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক পরিমাণ ডোপামিন ক্ষরণ হবে। সেই ডোপামিন ডেলটা FosB নামক এক উত্তেজক প্রোটিনকে জাগিয়ে তুলবে। একই সাথে ডেলটা JunD নামক এক কন্ট্রোলারকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। ব্যস! প্রায় এক মাস (কিংবা তার বেশি সময়) পর্যন্ত আপনার মনে সেই ইয়াবা খাওয়ার ইচ্ছা ঘুরপাক খাবে এবং অধিকাংশ মানুষই সেই ফাঁদে পা দেবে। তখন আর কী লাগে? আরও এক সমুদ্র ডোপামিন বের হবে আপনার মাথায়। এবার তো ডেলটা FosB পাগলা ঘোড়া। একে আর থামাতে পারবে না কেউই!

কিন্তু আপনি চাইলেই সেটা থামাতে পারেন। কীভাবে?

একবারের জন্য হলেও মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার মস্তিষ্ক এমনিতেই বেশ বোকাসোকা একটা যন্ত্র (বিশ্বাস না হলে ডিন বেনেটের লেখা The Idiot Brain বইটি পড়ে দেখতে

পারেন)। এই ব্যাটাকে ভুলেও আর ডোপামিনের ঝামেলায় ফেলতে যাবেন না।

সতর্কবাণী

১. এই অধ্যায়ে আসক্তির ক্রিয়া-বিক্রিয়া খুবই সাধারণ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। বাস্তবে আসক্তির ম্যাকানিজম অসম্ভব জটিল।

২. এই বইয়ের শুধু এই অধ্যায়টুকু শামীর মোন্তাজিদের লেখা।

লোকের কথা ও তোমার সিদ্ধান্ত

নিয়াজ আহমেদ, সিইও, কর্পোরেট আস্ক, কন্ট্রিবিউটর,
টেন মিনিট স্কুল

লোকে কী ভাববে, তা যদি আমিই ভাবি, তাহলে লোকে ভাববে কী? পুরো বইয়ে তোমরা দেখেছ, লোকে কত-কী ভাবতে পারে বা বলতে পারে। কিন্তু জীবনটা তোমার, তাই এখানে সঠিক সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। এই সঠিক সিদ্ধান্তটা কীভাবে নিতে পারবে, তাই নিয়ে আমার এই লেখা।

১. জীবনের শুরুতে একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করবে, তোমার জীবনে যদি কোনো টার্গেট না থাকে, তাহলে তুমি তা অ্যাচিভও করতে পারবে না। তোমার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি সিদ্ধান্ত এমন হতে হবে, যা তোমাকে তোমার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

২. লোকে কী বলবে, সেটা কানে তোলা যাবে না, তবে কেন লোকটা বলছে, সেটা কিছুটা বিবেচনা করা উচিত। যেমন বাবা-মা, শিক্ষক তাদের কথা শুনতে হবে। তাদের কোনো কথায় দ্বিমত হলেও সেটা সময় নিয়ে সমাধান করতে হবে। বাবা-মায়েরা তাদের রেফারেন্স পয়েন্ট থেকে তোমাদের সেরাটা দিতে চান। কিন্তু তুমি হয়তো অন্য কিছু চাও, কিছুটা সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে এগোনো ভালো। তুমি ধরো কন্টেন্ট রাইটার হতে চাও, এ রকম অদ্ভুত পেশা বা শব্দই তোমার

বাবা-মা শোনেন নাই, তাই হয়তো তারা বিরোধিতা করছেন, তাদের বোঝাও, একটু সময় নাও।

৩. তোমার প্রতিটি কথা বা কাজ এমন হতে হবে যা তোমাকে নেক্সট লেভেলে যেতে সাহায্য করে, যেটা নতুন এবং আগের চেয়ে বেটার। কথা বলবে কম, শুনবে বেশি, যে লাইনে এগোতে চাও, তা নিয়ে পড়াশোনা করবে, তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হবে না।

৪. সব ড্রপআউট জুকারবার্গ বা বিল গেটস হয়নি, চাকরি না পেয়ে কেউ জ্যাক মা হয় না। কাজেই, লাইফে ভালোমতো পড়াশোনা করার বিকল্প নেই। ভিন্ন কোনো অভ্যাস থাকলে, সেটা পড়াশোনাকে বাদ দিয়ে নয়; বরং পড়াশোনার পাশাপাশি কীভাবে করা যায়, সেটা বের করো।

৫. যেকোনো দলগত কাজ করার সময় সবার সাথে কথা বলে, বাকি সবার মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। নিজের কথা বা সিদ্ধান্ত অপরের ওপর চাপিয়ে দেবে না। যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব ধরনের তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাই করে নেবে। যে কাজ জানো না, ভালোভাবে না শিখে সেই কাজে সম্পৃক্ত হবে না। কাজ শিখে করবে, তাতে দুই দিন দেরি হলেও ভুল কম হবে।

৬. চার ধরনের লোকের সমালোচনা তুমি গ্রহণ করবে না। এক. সমালোচনার ছলে যারা বোঝাতে চায়, তারা ভালো, তুমি খারাপ। দুই. যারা সমালোচনার নামে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে, তিন. যারা মূল বিষয় এড়িয়ে অযথা কথা বাড়ায় এবং চার. যারা অন্যায়ের বিপক্ষে কথা বলতে বাধা দেয়। বন্ধুর প্রশংসা ও শত্রুর সমালোচনা দুটোই মূল্যহীন। সমালোচকের মুখ বন্ধ না করে, তোমার কান বন্ধ রাখো, মনে রাখবে, সমালোচনা তারাই করে, যারা কাজটি পারে না।

৭. সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে, নিজেকে নিয়ে ভাবা, নিজের ভুল সংশোধন করা, আর সবচেয়ে সহজ হচ্ছে অন্যের সমালোচনা করা। সব সময় খেয়াল করবে, তুমি নিজে যেন সমালোচকদের একজন না

হও। এমন কিছু করবে, যাতে তোমাকে নিয়ে চর্চা হয়। সমালোচনা করতে কোনো যোগ্যতা লাগে না, তবে সমালোচিত হতে ঢের যোগ্যতা লাগে।

৮. জীবনটা তোমার, জীবন একটাই, কাজেই একজীবনের খুব বেশি ভুল করার সুযোগ নেই। নিজের চারপাশে এমন লোকের বলয় তৈরি করো, যারা তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, যেসব বন্ধু সময় নষ্ট করায়, তাদের পরিহার করবে।

৯. যারা তোমার সামনে তোমার প্রশংসা করে এবং অন্যের সমালোচনা করে, তারা অন্যের সামনেও তোমার সমালোচনা করবে– এটাই তাদের চরিত্র। তাই তোমার সামনে কেউ অন্যের সমালোচনা করলে তাকে থামাও এবং নিজেও অন্যের সমালোচনা পরিহার করবে।

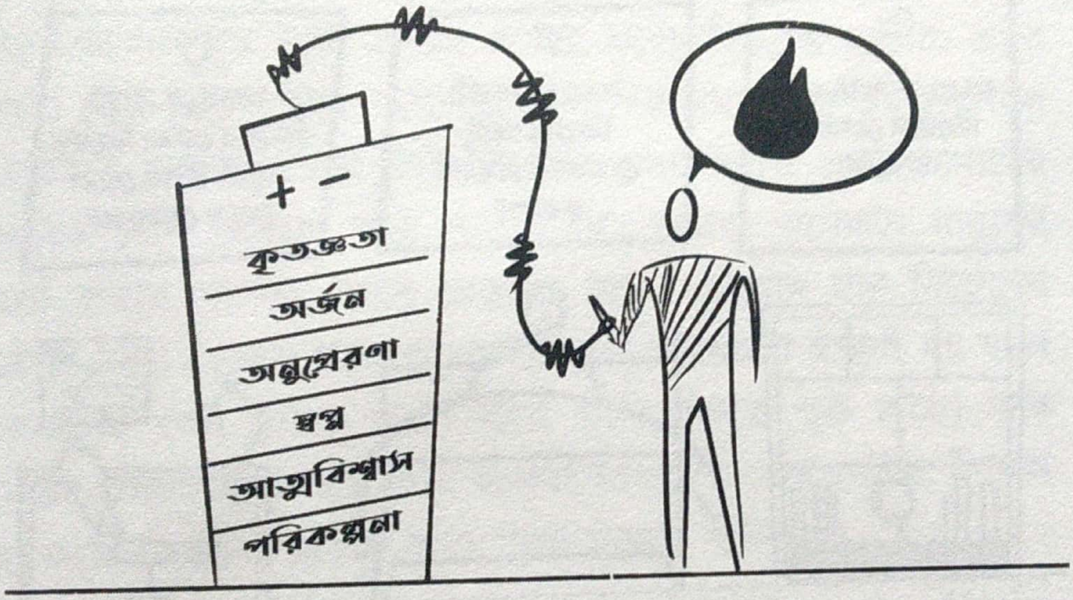
১০. গীবত করবে না, গীবত করা যে কত জঘন্য বাজে অপরাধ তা একটু ধর্মগ্রন্থগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। ধরো তুমি সারা জীবন অনেক টাকা আয় করেছ। শেষ জীবনে এসে তুমি পাগল হয়ে গিয়েছ। তুমি এতই উন্মাদ হয়েছ যে এবার তুমি একটা চেক বই নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছ ও যার সাথে দেখা হচ্ছে, তাকে চেক সই করে দিচ্ছ। তোমার সারা জীবনের উপার্জন লোকে নিয়ে যাচ্ছে। সেটা বোঝার ক্ষমতাও তোমার নেই। তুমি যখন গীবত করো তখন তোমার আমল থেকে ভালো কিছু কাজ যার নামে গীবত করছ তার কাছে চলে যায়।

ধরো, ঠিক এই মুহূর্তে নিউমার্কেটে আগুন লাগল, তোমার দোকানও পুড়ছে, আমার দোকানও পুড়ছে। তুমি কোন দোকানে পানি দেবে? নিজেরটায় বাদ দিয়ে অপরের দোকানে পানি দেওয়াটা বোকামি, আগে নিজের দোকানের আগুন নেভাও, এরপর আমাকে সাহায্য করবে। কারও নামে গীবত করার আগে নিজের দিকে একটু তাকাবে। একটা পাখি আকাশে উড়ছে, তার ডানায় দুটো পাথর বাঁধা, পাখিটা কিছু বেশি উড়তে পারবে না। আর পাথর দুটো খুলে

দিলে সে কিন্তু অনেক উঁচুতে উঠতে পারবে। গীবত হচ্ছে, সেই পাথরের টুকরা যা গীবতকারীকে নিচে নামিয়ে আনছে ক্রমাগত আর যাকে উদ্দেশ করে গীবত করা হচ্ছে তাকে অবমুক্ত করে দিচ্ছে।

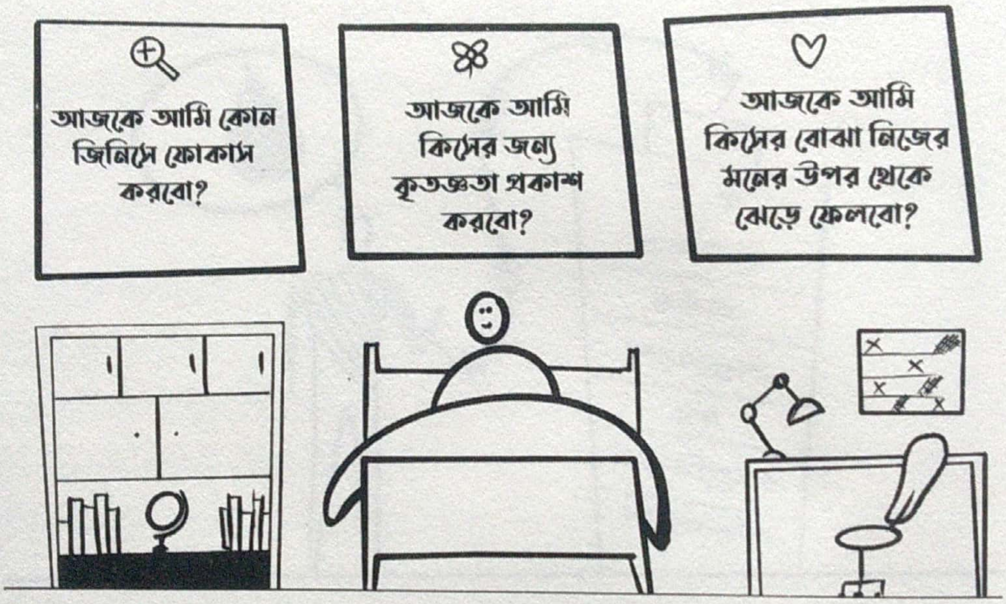
লোকে কী বলছে, তাই নিয়ে তুমি যদি কষ্ট পেয়ে থাকো, তাহলে তাদের পারলে মাফ করে দিয়ো আর প্লিজ, একটা অনুরোধ, তুমি নিজে তাদের একজন হতে যেয়ো না।

লোকের কথাকে কানে না তোলার বুদ্ধি!

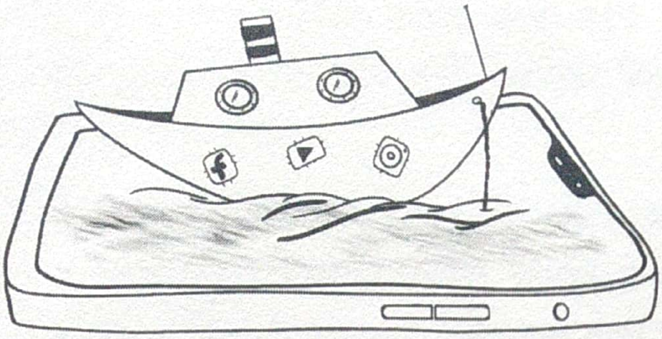


লোকে আমাদের আজ পর্যন্ত কী কী বলেছে সেটার হিসাব তো পুরো বইয়ে আমরা পেয়েই গেছি। এবার অন্য রকম এক বাক্স তৈরির আইডিয়া দিতে চাই। এটা হলো আপনার পাওয়ার ব্যাংক। পাওয়ার ব্যাংকের মতোই যখন আপনার নিজেকে রিচার্জ করার দরকার হবে তখনই এই পাওয়ার ব্যাংক আপনাকে রিচার্জ করে দেবে। এটা তৈরি করাও খুব সহজ। একটা ওয়াদা করেন যে আইডিয়াটা পছন্দ হলে ৩০ মিনিটের জন্য বইটা রেখে আপনার নিজের পাওয়ার ব্যাংকটা বানিয়ে ফেলবেন। পুরো বই জুড়ে বলা কথাগুলো প্রায়ই আমাদের শুনতে হয় আর সেটাতে আমাদের মুষড়ে পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখুন তো এই জীবনে আপনি কতবার এমন কিছু করে ফেলেছেন যেটা হয়তো নিজেই কল্পনা করতে পারেননি,

কতবার আশপাশের মানুষকে নিজের প্রাপ্তি দ্বারা চমকে দিয়েছেন, কতবার নিজের ইচ্ছাগুলোকে পূরণ করেছেন এবং অবাক করা কিছু করেছেন। এই অতীতগুলো একটা একটা করে ছোট কাগজে লিখে লিখে ভাঁজ করে একটি বাক্সে রেখে দিন আর যখন এই লোকের বলা কোথায় খারাপ অনুভব করবেন তখনই ওই বাক্স থেকে একটা একটা করে কাগজ তুলবেন আর পড়ে দেখবেন কেমন লাগে। আর হ্যাঁ, ওই বাক্সের গায়ে অবশ্যই পাওয়ার ব্যাংক লিখে রাখবেন আর দেখবেন আসলেই সেটা পাওয়ার ব্যাংকের মতোই কাজ করে।



পাওয়ার ব্যাংক বানানো হয়ে গেলে এবার চলুন আরেকটা জিনিস বানিয়ে ফেলি। এটা হলো 'লোকে কী বলবে?' থেকে বাঁচার ঢাল। আগেই যদি ঢাল দিয়ে এই সব কথা থেকে বেঁচে যাওয়া যায় তাহলে পাওয়ার ব্যাংকের দরকারই কিন্তু পড়বে না। এটার জন্য একটা কাগজে তিনটি জিনিস প্রতিদিন সকালে উঠেই লিখতে হবে। ১. যে চিন্তা ছেড়ে দেব। ২. যা নিয়ে আমি কৃতজ্ঞ। ৩. যাতে আজকে আমি ফোকাস করব। দেখবেন সকালেই দুই মিনিটে এই তিনটি জিনিস ঠিক করে ফেললে সেই দিন আর অগোছালো লাগবে না; বরং মনে হবে অনেক প্ল্যান করা একটা দিন কাটতে যাচ্ছে।



সোশ্যাল মিডিয়া এখন প্রতিটি জিনিসকেই একসাথে একই সময়ে অনেক বেশি মানুষের কাছে তুলে ধরছে। আগে যেখানে আমাদের বন্ধুবান্ধবের গন্ডি মাত্র ১০-১৫ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, এখন সেটা ১০০-১৫০ জনের মধ্যে প্রতিদিন বিরাজমান শুধু এই সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে। আর তাই মানুষের বলা কথাও এখন আমাদের অনেক বেশি দেখতে আর শুনতে হয়। আমরা অনেকটা মানুষের বলা কথার সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছি আমাদের যার যার নিজেদের নৌকা নিয়ে। ভেসে থাকতে সমস্যা নেই, সমস্যাটা তখনই হয় যখন আমাদের সেই নৌকা ফুটো করে পানি ঢুকতে শুরু করে। আর নৌকা তখনই ফুটো হয় যখন আমরা আমাদের হোম পেইজ, ইনবক্স বা কমেন্টে আসা প্রতিটি কথা গায়ে মাখতে শুরু করি।

এই 'ফেসবুক বুলি'-দেরকে একেক জন একেকভাবে প্রতিরোধ করেন। কেউ তাদের সাথে ঝগড়া করেন, কেউ কমেন্ট ডিলিট করে দেন, কেউ বা ব্লক করে দেন। আপনি এর যে কোনোটাই করতে পারেন। শুধু একটা কাজ করবেন না, এই বিষাক্ত মানুষগুলোর বিষাক্ত মন্তব্যগুলো গায়ে মাখবেন না। এটুকু ঠিক থাকলে আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার নৌকা যেভাবে ইচ্ছা ভাসাতে পারেন।

একটা গল্প দিয়ে শেষ করি

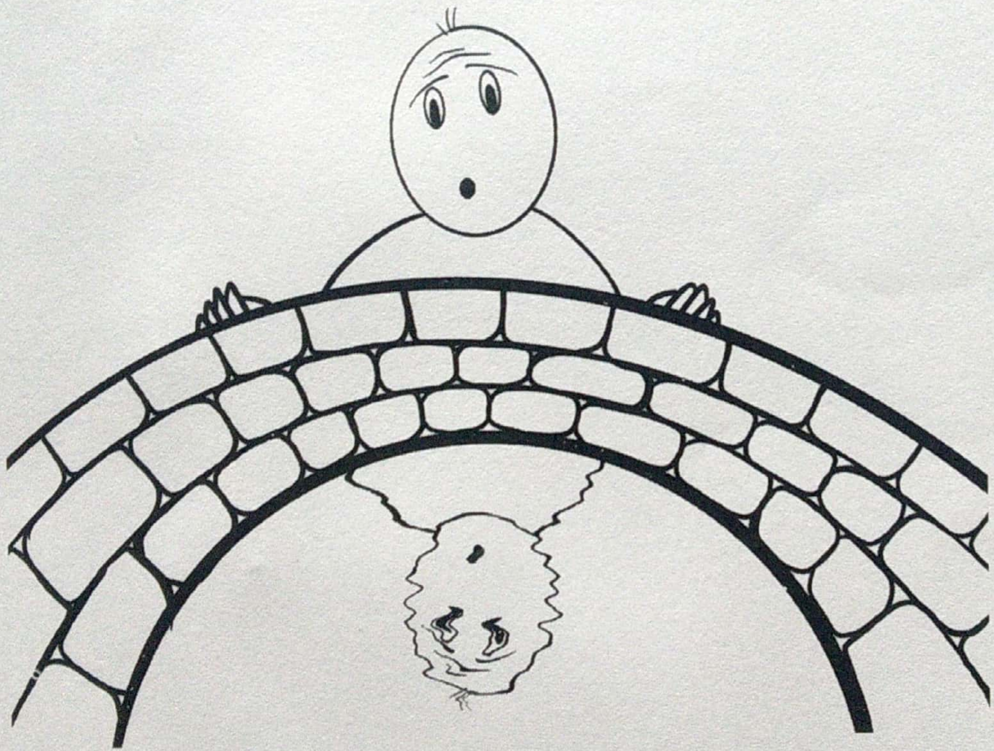
রুনি আর টুনি একই ক্লাসে পড়ে। রুনি সব সময় টুনির সাথে খুব দুর্ব্যবহার করে। ওকে অনেক খারাপ কথা শোনায়। টুনি তাই রুনিকে একদম দেখতে পারে না। টুনি ভাবে কীভাবে রুনিকে শাস্তি দেওয়া যায়। কোনো উপায় না পেয়ে টুনি রুনিকে মনে মনে শাস্তি দিতে থাকে। টুনি ওর মনের ভেতর একটা অন্ধকার কূপ তৈরি করে। আর সেই কূপের মধ্যে রুনিকে ফেলে দেয়। সেখানে অনাহারে বাস করতে থাকে রুনি। এই ভেবে টুনি মনে মনে শান্তি পায়। কিন্তু যখন সামনাসামনি রুনির সাথে দেখা হয়, টুনি দেখে রুনি বেশ ভালোই আছে। মহা আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টুনির বেশ রাগ হয়। টুনি ওর মনের কূপের ভেতরে থাকা রুনিকে আরও কষ্ট দিতে থাকে। এভাবে প্রতিদিন ওর রুনির সাথে দেখা হয় আর ও মনের ভেতর রুনিকে শাস্তি দিতে থাকে।

একদিন টুনি ভাবে, কূপের নিচে গিয়ে দেখে আসবে বদ রুনি কতটা কষ্ট পাচ্ছে। টুনি কূপের গভীরে একটা টর্চ মেরে দেখে, এ কী! রুনি কোথায়? এ তো টুনি নিজেই। এত দিন তাহলে এই কূপের মধ্যে টুনি নিজেকেই কষ্ট দিয়েছে?

রাগ বা অভিমান ঠিক এ রকম একটা কূপের মতো। যারা আমাদের নানা রকম কটু কথা বলে, তাদের আমরা আমাদের 'রাগ'-এর কূপের মধ্যে ফেলে দিতে চাই। আমরা তাদের জন্য মনের মধ্যে রাগ পুষতে থাকি। কিন্তু আসলে এই রাগের কোনো অংশই ওই মানুষ

পর্যন্ত পৌঁছায় না। মাঝখান দিয়ে মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখতে রাখতে আমাদের মনটাই ভারী হয়ে ওঠে। আমরা নিজের বানানো কারাগারের কয়েদি হয়ে যাই।

একটা বুদ্ধি বলি? মনের ভেতরের ওই কূপটা ভেঙে ফেলুন। কারও জন্য রাগ পুষে রেখে ওই মানুষটার কিছুই আপনি করতে পারবেন না। শুধু শুধু আপনার নিজের কষ্ট হবে। দরকার হলে সামনে থেকে প্রতিবাদ করুন। আর যদি সম্ভব হয়, ক্ষমা করে দিন। যে আপনাকে কটু কথা বলেছে বা যার ওপর আপনি রাগ ধরে রেখেছেন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া, এ ধরনের মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায়।



নিজেকে জিজ্ঞেস করুন। ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত কজনের জন্য মনে রাগ জমিয়ে রেখেছেন? আজ সবাইকে মন থেকে ক্ষমা করে দিতে চেষ্টা করুন। দেখবেন, সত্যি সত্যি আপনার মুক্তি হয়েছে।

সাকিব বিন রশীদ 10 Minute School-এর প্রধান শিক্ষক। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এনজিও ব্র্যাকের ডেপুটি ম্যানেজার পদে কর্মরত রয়েছেন। তিনি তাঁর ভিডিওর মাধ্যমে লক্ষাধিক শিক্ষার্থীকে ইংরেজি, বিতর্ক ও সাধারণ জ্ঞান পড়িয়ে আসছেন। পড়ালেখার বিষয় বাদেও তাঁর বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতাভিত্তিক ভিডিও প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মজার বিষয় হলো তিনি এখনো নিজের এসব প্রাতিষ্ঠানিক কঠিন পরিচয় না দিয়ে নিজেকে অনেক মজা করে উপস্থাপন করতে পছন্দ করেন। কীভাবে? সেটা আর এখানে বলতে চাই না। এটা দেখতে বরং আপনি একবার তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে ঢুঁ মেরে আসুন। অবাক হবেন।

Sakib Bin Rashid



প্রচ্ছদ: আসিফ হোসেন

~আত্মোন্নয়ন~

সবই টাকা কমানোর ধান্দা

বিয়ে করায় দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে

নোয়াখাইল্লা/ বরিশাইল্লা/ সিলোটি মানুষই খারাপ

তুই যে পারবি না এটা আমি আগেই জানতাম

খালি তো ফেইসবুক চালাও এরপর কী চালাবা? রিকশা না ঠ্যালাগাড়ি?

বখাটেদের মতো গান বাজনা করতেছ?

সায়েন্স পড়ে আবার কেউ বিবিএ পড়ে নাকি?

পড়ার বই বাদ দিয়ে এইসব হাবিজাবি কী বই পড়ো?

তুই যে কী করবি এটা আমাদের ভালোই জানা আছে

ওর পা ধুয়ে পানি খাও

উঃ, আসছে আমার ইংলিশ সাহেব

এইসব করে তো ভাত পাবা না

তুমি তো ইংলিশ মিডিয়ামের ফার্মের মুরগী

তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবেনা

ডিএসএলআর কেনা একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে এখন

ডুড, তুমি ইংরেজী বলতে পারো না? হাহাহা

গল্পের বই বাদ দিয়ে পড়ার বই পড়ো

এটা তো ছেলেদের কাজ না

তুমি ছেলে হয়ে দায়িত্ব নিচ্ছো না কেন?

আপনার বৌ চাকরি করে, আপনি কিছু বলেন না?

মেয়ে হয়ে এসব কেন করো?

মেয়েদের মতো কাঁদিস কেন?

ক্লাব তো করিস প্রেম করার জন্য

এই পিচ্চি/ ছোটু

পুরুষ মানুষ হইলে এইটা করে দেখাও তো

তুমি এত প্রশ্ন করো কেন?

ব্যবসা করবা? কেন, চাকরি পাও নাই?

তোমার ব্রেকাপ হয়ে গেসে? আমি আগেই বুঝছিলাম

এত ছোট বয়সে জব করবা কেন? মা বাবা গরীব নাকি?

তুই ভারত সাপোর্ট করিস? তুই তো ভারতের দালাল

আমার বউ কিচ্ছু করে না

প্রতিবন্ধী/হিজড়াদের মতো করিস কেন?

এখনো বিয়ে করছো না কেন?



ADARSHA
+88-02-9612877, +880-1793296202
Email : info@adarsha.com.bd
Web : www.adarsha.com.bd
ISBN 978-984-8040-91-1
9 789848 040911